দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত
এই অশিষ্টাচারের পাথেয় কোথায় ?
— পৃঃ ২৩

মণিপুরে হিংসায় চীনা যোগ
দুই প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষের একই মত— পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা।। ২১ আগস্ট, ২০২৩।। ৩ ভাদ্র - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

রাজ্য - রাজ্যপাল সংঘাত

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৫১ সংখ্যা, ৩ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২১ আগস্ট - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'গোপাল সেন' হত্যাকারীর বংশধররা আজও বেঁচে আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নাকি যমালয়?
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ওঁরা কি বাড়ি ফিরবে না? জয় করেও ভয় কীসের!
□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ওদের ভাষা, ওদের ভবিষ্যৎ □ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম্ □ ৮

সংসদে রাহুল গান্ধীর অভব্য আচরণ □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ভারতের বদনাম করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিব্রত করার নিরন্তর প্রয়াস চলছে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১১

মণিপুর হিংসায় চীনা যোগ দুই প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষের একই মত
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৩

অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত না করলে দেশে অস্থিরতা চলতেই থাকবে □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৫

মণিপুরে হিংসার বীজবপন করেছে কংগ্রেস সরকার
□ বরুণ মণ্ডল □ ১৭

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত—এই অশিষ্টাচারের পাথেয় কোথায়?
□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৩

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ও রাজ্যপাল—এক অন্তহীন দ্বন্দ্বের তত্ত্বতালাশ □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ২৬

মানব কল্যাণার্থে পূজিত হন বৈদিক দেবতাগণ
□ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ৩১

শ্রীখাটু শ্যাম রূপে বর্বরিকের মস্তক আজও পূজিত হয়
□ জয়ন্ত শীল □ ৩৩

তিব্বতে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
□ দীপক খাঁ □ ৩৪

নতুন ভারতের জন্য ব্রিটিশ আইনের বহিষ্কার এবং নয়া দণ্ডসংহিতা নির্মাণ আবশ্যক □ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস □ ৩৫

ভারতের মেধার ওপরে সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী
□ ৪৩

রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা রাষ্ট্রভাব নির্মাণের স্তম্ভস্বরূপ
□ চন্দন রায় □ ৪৬

রাজ্যে লাগামছাড়া দুর্নীতি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে
□ ডাঃ সমরজিৎ ঘটক □ ৪৭

ভারতীয় মনীষীরা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চেয়েছিলেন
□ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে ২৮ আগস্ট, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাখিবন্ধন

প্রকাশিত হবে ২৮ আগস্ট, ২০২৩

রাখির সঙ্গে বন্ধন কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। সাধারণভাবে ভারতবর্ষে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে ভাইয়ের সুস্থ ও সফল জীবন কামনা করে। কিন্তু রাখিবন্ধন শুধুই ভাই-বোনের উৎসব? বোধহয় না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবার হাতে রাখি বেঁধে সৌভ্রাতৃত্বের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। দৃঢ় হয়েছিল জাতীয় সংহতি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় রাখিবন্ধন।

লিখবেন— অশোক কুমার ঠাকুর, রাজদীপ মিশ্র, ড. প্রণব বর, সৌরভ সিংহ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাংবিধানিক পদের অবমাননা সংস্কৃতি বিরুদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য-রাজপাল দ্বন্দ্ব খুব পুরাতন হইলেও রাজ্যপাল পদের অবমাননা শুরু হইয়াছে বাম আমল হইতে। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যপাল পদটির বিলুপ্তিরও দাবি করিয়াছিল। তখন নাকি বিরোধী নেত্রীর মতামতকে রাজ্যপাল গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বর্তমানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বামেদের দাবিকেই মানিয়া লইয়া রাজ্যপাল পদটির বিলুপ্তির দাবিই শুধু জানান নাই, তিনি রাজভবনকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করিবার কথাও বলিয়াছেন। বামফ্রন্টের মতোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল পদটির বিলুপ্তির দাবি এইজন্যই জানাইতেছেন যে রাজ্যপাল প্রকৃতপক্ষেই সংবিধানের রক্ষকের ভূমিকা পালন করিতেছেন। বাম জমানায় রাজ্যপালের সহিত তাহাদের সংঘাতের কারণ হইল তাহাদের লাগামছাড়া সন্ত্রাস বিশেষ করিয়া নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে রাজ্যপালের গর্জিয়া ওঠা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ। তাই তাহারা বারবার রাজ্যপালের অপসারণ চাহিয়াছে। বামেদের রাজত্বের অবসানের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসীন হইয়া বিরোধীদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারে তিনি এবং তাঁহার দল মাতিয়া উঠিয়াছেন। বিগত পঞ্চায়েত এবং বিধানসভা নির্বাচনে এত অত্যাচার ও রক্ত রাজ্যবাসী পূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। স্বভাবতই সংবিধানের জাগ্রত প্রহরী রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করিয়াছেন, সন্ত্রাস বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। সর্বোপরি তাহাদের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহাতেই রাজ্যপালের এক্তিয়ার লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সময় রাজ্যপাল পদের অবমাননা শুরু হইয়াছে। জগদীপ ধনখড়ের সময় তাহা তুঙ্গে উঠিয়াছে। বর্তমানে সিভি আনন্দ বোসের সময় তাহা সমস্ত শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়াছে। তিনি নিজে শুধু রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেছেন না, তাঁহার মন্ত্রীসভার মন্ত্রী, এমনকী দলের চুনোপুঁটি নেতা-নেত্রীরাও কটূক্তি করিতে ছাড়িতেছেন না। তাহারা কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই পাড়িয়া থাকেন, অথচ রাজ্যপালের মতো সাংবিধানিক পদের অবমাননা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্মান জানাইবার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে অঙ্গ রাজ্যপাল পদ, তাহা তিনি ভুলিয়া যান। রাজ্যপালকে সংবিধানের রক্ষক হিসাবে শপথ লইতে হয়। তাঁহাকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যের প্রধান বিচারপতি। রাজ্য সরকারের অসাংবিধানিক কাজকর্ম অথবা রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হইলে রাজ্যপালের রাজ্যকে সাবধান করিবার অধিকার রহিয়াছে। সংবিধান তাঁহাকে স্বেচ্ছাধীন কয়েকটি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। তাহা প্রয়োগ করিবার সময় তিনি রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। রাজ্য প্রশাসনের তিনি প্রধান হইলেও রাজ্য বিধানসভার সদস্য নন। তথাপি তিনি রাজ্য বিধানসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যপাল আলংকারিক পদ নহে। সংবিধান লঙ্ঘিত হইলে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

বর্তমানে এই রাজ্যের সর্বদিক হইতে অধোগমন সমগ্র দেশ তথা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করিতেছে। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপরে চলিতেছে লাগামছাড়া সন্ত্রাস। নির্বাচনের সময় রক্তের হোলিখেলা চলে। রাজ্যপাল ইহার প্রতিবাদে মুখ খুলিলেই সংবিধানের লক্ষণরেখা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া কটূক্তি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ভুলিয়া যাইতেছেন যে সংবিধান রাজ্যপালকে নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের মতো ক্ষমতা রহিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিধানসভায় আইন প্রণয়ন করিয়া স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হইয়া দলদাস উপাচার্য নিয়োগ করিয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজ্যপাল ইহার প্রতিবাদ করিলেই অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করা হইতেছে। রাজ্যপালের সহিত সংঘাতে রাজ্যের পরিবেশ কলুষিত হইতেছে তাহা মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, সাংবিধানিক পদের অবমাননা রাজ্যবাসী পছন্দ করিতেছে না।

সুভাষিতম্

গৌরবং প্রাপ্যতে দানাৎ ন তু বিত্তস্য সঞ্চয়াৎ।
স্থিতিঃ উচ্চৈঃ পয়োদানাং পয়োধীনাং অধঃ স্থিতিঃ।।

দানের মাধ্যমেই গৌরব প্রাপ্ত হয়, বিত্ত সঞ্চয়ে নয়। জল দানকারী মেঘের স্থান উপরেই হয় কিন্তু জল সঞ্চয়কারী সমুদ্রের স্থান নীচে।

‘গোপাল সেন’ হত্যাকারীর বংশধররা আজও বেঁচে আছে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নাকি যমালয় ?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সাতের দশকের গোড়ায় চোরের মতো পিছন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেনকে হত্যা করেছিল এক উঠতি নকশাল। সেই মাতৃগর্ভের লজ্জার নাম লিখতে ঘেন্না হয়। এই মুহূর্তে সেই অপগণ্ড আর অপজাত সন্তানদের তালিকায় ন'টি নাম যোগ হয়েছে। তালিকা লম্বা হবে। কারণ পুরোনো নকশালদের মতো যাদবপুরে আর ব্যক্তিহত্যা হয় না। কায়দা পালটে সম্মিলিত খুন বা হত্যা হয়। যেমনটা ঘটেছে অসহায় নাবালক স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর ক্ষেত্রে। এর পক্ষে ‘সিস্টেম’-এর কুযুক্তি সাজাচ্ছে একদল প্রত্যাহত বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো চটুল আর অসাধু শিক্ষিতদের দল। তারা ‘দোষ কারো নয়গো মা’ গোছের গাওনা গাইছে। সিস্টেমের দোষ দিচ্ছে।

উত্তরপাড়ার একটি সংস্থার কলুষিত ঔরসেই তৈরি হয়েছে যাদবপুরের এইসব অপজাত সন্তানরা। নামজাদা এক সিপিএম নেতার মদতে খুন করে বিদেশে পালিয়েছিল বিখ্যাত চিকিৎসকের ছেলে ওই খুনি নকশাল। ডাক্তারটি এক সিপিএম নেতার বন্ধু ছিল। কুকুর নিয়ে পুলিশ তার ছেলেকে ধরতে যাচ্ছে তিনি আগেভাগে জানিয়ে দেন। চম্পট দেয় সেই কাপুরুষ নকশাল। শুনেছি সে পশু আর জীবিত নেই। তার শাস্তি হয়নি। বাজারে বংশধর ছেড়ে যাদবপুরে ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে। গোপাল সেনের ব্যক্তি হত্যা দিয়ে যে হত্যালীলা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল নিরীহ স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মত্যু দিয়ে তা শেষ হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। স্বপ্নদীপকে যারা নগ্ন করে হত্যা করেছে এবার তাদের নগ্ন হওয়ার পালা। রাজ্যের মানুষ আর প্রশাসনকে সম্মিলিতভাবে সেই খুনি বাম ঘরানাকে নির্মূল করতে হবে। সভ্যতার কদর্মাক্ত বিষাক্ত ওই পোকাদের কোনোভাবেই বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়।

দুর্বল আর অসুস্থ মানসিকতার ওই অপজাতদের চরমতম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়াটাই হয়তো নিদর্শন ছিল। আর তা না হলেও তার সমান্তরাল কিছু হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তার প্রমাণ আদালত আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে একটিবার দিতে হবে। নাহলে রাজ্যের শিক্ষার মুখে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ মুছবে না। রাজ্যের দুর্ভাগ্য তার শিক্ষামন্ত্রীকে অনেকে ‘বোকা ব্রাত্য’ ভাবেন। রাজ্যপালের সঙ্গে বর্তমান বল ঠেলাঠেলি তার প্রমাণ। তবে আমার মতে কিছু গর্ভ লজ্জার ছাত্র আর প্রাক্তনী যেমন স্বপ্নদীপের হত্যার জন্য দায়ী তেমনই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী যাদবপুরের আহাম্মক কর্তৃপক্ষ। সেখানে প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামকের বিরুদ্ধে চুরির তদন্ত হয়। ছাত্রকে নিপীড়ন করা হচ্ছে জেনেও অর্বাচীন ছাত্র যাজক ঘুমিয়ে পড়েন। হোস্টেল সুপার হাওয়ায় মিলিয়ে যান। ছাত্রটি মারা যাওয়ার পর লুকিয়ে তারা দেহ হাপিস করার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যায় হস্টেলের মেস কমিটি। ধরা পড়া পশুদের নাম নিলে প্রতিবেদন দূষিত হবে। উগ্র বামেদের বংশধররা তাদের পিতাদের থুথু চেটে এখন কাজ চালাচ্ছে। গাঁজা, মদ, চন্ডু,চরসের কারবার, দেশ বিরোধী স্লোগান আর অশ্লীলতার পীঠ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিবাদ আর স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে সেখানে জোর করে সিসিটিভি বসতে দেওয়া হয় না। একগুচ্ছ ভেড়ার পাল মেরুদণ্ডহীন শিক্ষক আর কর্তৃপক্ষ তা নতমস্তকে মেনে নেয়। কয়েকবছর আগে বেকায়দায় পড়ে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ একটি সত্য বলে ফেলেন— ‘মদ, গাঁজা বন্ধ তাই কি প্রতিবাদের গন্ধ।’ এরপরও নাকি পাঁচতারা মার্কা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর। সে তারাগুলো কোন আকাশে জানতে ইচ্ছে করে। বোধহয় এনআইআরএফের ভেবে দেখা উচিত কালসাপটার কী নাম। আশির দশকে ‘লাল পতাকাকে লজ্জার পতাকা’ বলে উগ্র বামেদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এক জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক। তাতে নকশাল অত্যাচারের পাশাপাশি ‘চীন বাবা, চীন মা’ বন্দনা বিরোধী কথা ছিল। ধান্ধাবাজ আর সুযোগসন্ধানী এক নাট্যকার সেই সময় চীনের জারজ সন্তান সেজেছিলেন। তাদের এক বংশধর কিছুদিন আগে ‘পলিটিসাইজিং’-এর ভড়ংবাজির নামে স্বপ্নদীপকে হত্যা করেছে। এর কুৎসিত নাম র‍্যাগিং। পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের দশককে তার পিতা আর ঠাকুর্দারা মৃত্যুর দশক বানিয়েছিল। অস্ত্র জোগাড়ের নামে সে সময় তারা নিরীহ পুলিশ মারতো।

বোকা বিপ্লবের ধুনি জ্বালিয়ে শ্রেণীশত্রু খতম করত। সংশোধনবাদ বিরোধের নামে নিরীহ মানুষ মারত। স্নায়ু রোগে আক্রান্ত তাদের নেতার আটটি দলিলের বাস্তবায়নে তারা রাজ্যজুড়ে তাণ্ডব আর নৈরাজ্য চালিয়েছিল তিন বছর ধরে। যাদবপুরে সে ট্র্যাডিশন এখনো চলেছে। তাদের তাণ্ডবে জেগে উঠেছিল লুম্পেন সর্বহারার দল। সত্তরের দশকে বিপ্লবের ভোল পালটে হয় লুম্পেন আন্দোলন। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন আগেই বেড়া পড়েছে। যাদবপুর খুব দূরে নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ‘বর্বর আর নরপশুরা কেবল চাবুক আর লাঠির ভাষা বোঝে।’ যাদবপুরের কিছু পশুকে সেই ভাষাটাই শেখাতে হবে। তবেই স্বপ্নদীপের আত্মা বহ্নিমান হবে। শান্তি পাবে। □

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ‘বর্বর আর নরপশুরা কেবল চাবুক আর লাঠির ভাষা বোঝে।’ যাদবপুরের কিছু পশুকে সেই ভাষাটাই শেখাতে হবে।

ওঁরা কি বাড়ি ফিরবে না?
জয় করেও ভয় কীসের!

বিজয়ীযু দিদি,

সদ্যই স্বাধীনতা দিবস গেল। আর ২৫টা বছর কাটলেই দেশ স্বাধীনতার শতবর্ষে পড়বে। মনে হচ্ছে অনেকটা সময় কিন্তু বেশি নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এই তো দেখুন না আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ১২টা বছর হয়ে গেল। সময় বসে থাকে না। আমার মনে পড়ছে আপনার সেই স্লোগানটার কথা। সেটারও ১২ বছর হয়ে গিয়েছে— 'বদলা নয়, বদল চাই'। কী দারুণ বলেছিলেন দিদি! কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ভাবি সত্যিই কি বদল এসেছে? নাকি এখনও বদলা-সংস্কৃতিই রয়ে গিয়েছে। এত জয় পেয়েছেন আপনি। তাই তো আপনাকে 'বিজয়ীযু' বলে সম্বোধন করলাম। কিন্তু তবু আপনার এত ভয় কেন?

কিছুটা তথ্য দিই বরং। দিদি, পঞ্চায়েত নির্বাচন অনেক দিন হয়ে গেল শেষ হয়েছে। জানি, আদালতে অনেক আসন নিয়ে নিষ্পত্তি হয়নি, তবে বহু জায়গায় বোর্ড গঠনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার পরেও বিরোধী দলের যাঁরা জিতেছিলেন তাঁদের অনেকে এখনও বাড়িই ফিরতে পারেননি। বাড়ি ফিরবেন, গ্রামে যাবেন তবে না আপনার উন্নয়ন যজ্ঞে শামিল হবেন! দিদি, হতে পারে তাঁরা বিরোধী দলের প্রতিনিধি কিন্তু আপনার রাজ্য সরকার তো ওঁদের নিয়েও। গ্রামোন্নয়ন হবে কী করে? আপনি আরও একবার জোর গলায় বলুন না— 'বদলা নয়, বদল চাই'। সেটা শুনে আপনার ভাইয়েরা যদি ওঁদের বাড়ি ফিরতে দেয় তবে ভালো হবে। বলুন তো জয়ীরা কত দিন দলীয় দপ্তরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকবে। শুধু কি জয়ীরা? ঘরছাড়া অনেক বিরোধী দলের কর্মী, তাঁদের পরিবার। কবে বাড়ি ফিরবেন তা ওঁরা জানেন না। ২০১৮ সালেও একই রকম হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক বছর ঘুরে গিয়েছিল। দিদি, অনেকে অন্য রাজ্যে গিয়েও রয়েছেন প্রাণের ভয়ে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সত্যিই যদি জানা না থাকে পুলিশকে বললে এক বেলায় আপনাকে রিপোর্ট দিয়ে দেবে। দেখুন না দিদি, প্লিজ।

দিন কয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে একটা লেখা পড়ছিলাম। সেখানে বলা হয়েছে, ১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বামপন্থী কর্মীরা অনেকেই বাড়ি ফিরতে পারেননি। কংগ্রেসের ভয়ে বছরের পর বছর গ্রামছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে। কংগ্রেস শাসনের পতন ও পরবর্তী বছরগুলিতেও একই কাণ্ড হয়েছে। ১৯৭২ সালে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচন করেছিল গুন্ডাবাহিনী দিয়ে। ১৯৭১-এর নির্বাচনে ১১৩টি আসন পাওয়া সিপিএম ১৯৭২ সালে জেতে মাত্র ১৪টি-তে। হেরেছিলেন জ্যোতি বসু। ইন্দিরা কংগ্রেস পেল ২১৬টি আসন, সহযোগী সিপিআই পেল ৩৫টি।

১৯৭৭-এ দেশে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পরে ভাঙাচোরা সংগঠন নিয়েও বামফ্রন্ট ২২৯ আসনে জেতে। জেতার পরেই কংগ্রেস হয়ে যায় তারা। ৩৪ বছর ধরে দেখিয়েছে, হিংসার জোরে ক্ষমতায় থাকা কাকে বলে! তাই তো ওদের সরিয়ে এরাজ্যে আপনাকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু শাসনে এসেই তৃণমূল হয়ে গেল সিপিএম।

বামফ্রন্ট আমলে ২০০৩ ও ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত্যু হয় যথাক্রমে ৮০ জন ও ৪৫ জন। তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমের যোগ্য ছাত্রের মতো সেই ধারাই বজায় রেখেছে। তৃণমূল আমলে ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত্যু ৩১ জনের, ২০১৮ সালে ৭৫ জনের। আর ২০২৩ সালে এখনও পর্যন্ত ৬০ পার হয়ে গিয়েছে। ২০১৮ সালে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩৩ শতাংশ আসন জিতেছিল। সেটা এবার কমে ১১ শতাংশ। এটুকু তফাতের পিছনে কয়েকটা কারণ রয়েছে। এক, রাজ্যে বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির উত্থান। ৩ থেকে ৭৭ বিধায়ক বিধানসভায়। সাংসদ সংখ্যা ১৮। পরে যদিও কমেছে। দ্বিতীয় কারণ, বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এ বার আদালত অনেকটাই নজরদারি রেখেছিল।

আপনি আগেও বলেছেন যে, আপনার দলের লোকেরাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশি নিহত হয়েছেন। এই সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। তবে আরও একটা হিসেব পেলাম। প্রথম ৫০ জন নিহতের মধ্যে ৩২ জন (৬৪ শতাংশ) মুসলমান সম্প্রদায়ের। এই ৫০ জনের মধ্যে ৩৭ জনের (৭৪ শতাংশ) মৃত্যু হয়েছে মূলত মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়ায়। আরও একটা বিষয় যে, প্রায় সব মৃত্যুই বোমা বা আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা। সুতরাং একটি বিষয় পরিষ্কার যাঁরা মৃত তাঁদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচয় যাইহোক না কেন সংঘর্ষ হয়েছিল অস্ত্রের। যা বদলার রাজনীতির অঙ্গ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাই আপনার কাছেই প্রশ্ন, শুধু নির্বাচন বা গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই নয়, রাজ্যে এত বোমা-বন্দুকের সমাগম কেন?

সকলেই কি আসলে বদলা নিতে চায়? এরাজ্যে কী তবে বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই? এই জায়গা থেকেই ভয় করে দিদি। ভয় করে, বদলার রাজনীতির বিরুদ্ধে এরাজ্যের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাঁরা কি এবার রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের কথাই ভাববেন? ঠিক ১২ বছর আগে যেমনটা ভেবেছিলেন। ভয়ে করে দিদি, ভয় করে।

অতিথি কলম

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যম

ওদের ভাষা ওদের ভবিষ্যৎ

যে শিক্ষা শিশুদের সহজবোধ্য, যার আত্তীকরণ শিশুদের সহজসাধ্য— সেই শিক্ষা প্রণালীর প্রচলন হলে আরও ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত, সহনশীল ও সফল ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।

ভারতবাসীর আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকেন্দ্রিক বিতর্ক উত্থাপিত হলে গবেষণালব্ধ প্রমাণের মাধ্যমে একটি অকৃত্রিম, অভিন্ন সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। সেই সত্য হলো শিশুকালে যে ভাষাটি শিশুদের বোধগম্য, সেই ভাষায় শিশুদের শিক্ষাদান হলো সমগ্র শিক্ষাগত পদ্ধতির একটি অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এই সত্যের বিপ্রতীপে ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ তাদের শিশুকালে বোধগম্য মাতৃভাষায় শিক্ষারহিত যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাগত বিপর্যয় ও সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে গত ২১ জুলাই সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) কর্তৃক জারি 'মাতৃভাষায় শিক্ষাদান' সংক্রান্ত নির্দেশটি একটি সদর্থক পদক্ষেপ। ভারতবর্ষ ও এই দেশের উন্নত, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে তুচ্ছ আখ্যা দিয়ে, চূড়ান্ত অবজ্ঞা করে থমাস ম্যাকলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করেন। এই বিষয়ে তাঁর এই উক্তি তাঁর সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খোলাখুলি ব্যক্ত করে- "to form a class who may be interpreters between us and themillions whom we govern... (to create) a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."। এই পটভূমিতে গান্ধীজী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে হরিজন পত্রিকায় জোরালো যুক্তি সহকারে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন— "English, having been made a medium of instruction in all branches of learning, has created a permanent barrier between the highly educated few and the uneducated many. It has hindered the dissemination of knowledge to the masses. The excessive emphasis on English has burdened the educated class, leaving them mentally impaired for life and disconnected from their own land."।

বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, অ্যানি বেশান্ত প্রমুখ বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত, নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে দেশীয় শিক্ষাদান পদ্ধতিকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। এই মনীষীগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের মহান উপলব্ধির অধিকারী হওয়ার দরুন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত ও সচেতন ছিলেন। এই কারণে সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমি পন্থা প্রয়োগের অধিবক্তা, পশ্চিমি চিন্তাধারার প্রভাবে আচ্ছন্ন জওহরলাল নেহরুর পথে না হেঁটে এই মহান দেশপ্রেমিকরা শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তা ও প্রভাবের উপযোগিতার বিষয়ে একটি ভারসাম্যযুক্ত মূল্যায়ন পোষণ করতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুরু করে তারপর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশের বিষয়ে তাঁদের দূরদর্শী ভাবনা ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁদের মত অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রারম্ভিক পর্বে মাতৃভাষার প্রয়োগ হলে এবং তারপরে ইংরেজি সংযোজিত হলে, তাদের আত্মপরিচয় ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। অ্যানি বেশান্ত তাঁর রচিত 'Principles of Education' গ্রন্থে দেশের প্রতিটি জেলায় দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি-সহ মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানকারী বিদ্যালয় সমূহের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে গঠিত এই শিক্ষাব্যবস্থা কি ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মজীবনে সাফল্য লাভের

পথে কোনো অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে? উত্তর হলো, না। ১৯৫৩ সাল থেকেই ইউনেস্কো তার গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্টের মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে জোরালো ভাবে মতপ্রকাশ করে চলেছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে তাদের সেই বার্তার পুনরাবৃত্তি করে তারা বলে- "To be taught in a language other than one's own has a negative effect on learning, especially for children from poor families."। এই রিপোর্টে একটি অঞ্চল, রাজ্য বা দেশের ৫০ শতাংশের কম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বা সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের শিক্ষার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ বছর তাদের সংশ্লিষ্ট মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে ইউনেস্কো সুপারিশ করে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কোর একটি গবেষণাধর্মী রিপোর্টে শিক্ষাগত যুক্তির বিচারে মাতৃভাষা ভিত্তিক দ্বিভাষিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে অবিতর্কিত বলে উল্লেখিত হয়। এরপরেও যে প্রশ্নটি রয়ে যায় তা হলো ভারতে পরিষেবা ক্ষেত্রে বর্তমানে ভালো চাকরি লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজির জ্ঞান অপরিহার্য, সেই কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের এই পদ্ধতি কি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো চাকরি লাভের সুযোগ হতে কোনো ভাবে বঞ্চিত করবে?

এরও উত্তর হলো, না। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সূত্রপাত এবং পরবর্তীতে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে ইংরেজি অধ্যয়ন ও অনুধাবন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে। শিশুরা প্রারম্ভিক শিক্ষার ঠিক পরবর্তী সময়কালে দ্বিতীয় ভাষার অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হওয়ায়, শিশুদের গঠনমূলক বছরগুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কারণে তাদের দ্বারা বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে দক্ষতার অমূল্য ও অনন্য বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। কানাডার অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় প্রকাশ যে ছোটবেলায় প্রারম্ভিক শিক্ষাপর্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের দরুন মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের ফলে পরের স্তরে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় ভাষার আত্তীকরণে ছাত্র-ছাত্রীরা সফল হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাটিন আমেরিকান বংশোদ্ভূত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর একটি ৮ বছর ব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে পরিচিতি লাভের সময়ক্ষণ বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে ইংরেজিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় মাতৃভাষা স্প্যানিশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইংরেজিতে অধিক দক্ষতা অর্জন ও নজরকাড়া সাফল্য প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম ভাষাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত দক্ষতা এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষায় উন্নততর ফলাফল ভাষা ও বোধশক্তির জ্ঞান প্রাথমিক স্তরের প্রথমটির ভিত্তিভূমির ওপরে দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বকেই প্রমাণ করে। আইএসবি-তে কর্মরত থাকাকালীন আমার প্রাক্তন সহকর্মী তরুণ জৈনের গবেষণা অনুযায়ী মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষাদান, সাক্ষরতার হার ও কলেজে স্নাতকস্তর উত্তীর্ণদের হার যথাক্রমে ১৮ ও ২০ শতাংশ হ্রাসের কারণ। শিক্ষাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, এই তত্ত্বের পক্ষে একাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার দরুন ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রণালী ছাত্র-ছাত্রদের উন্নতির অপরিহার্য পদ্ধতি। এহেন অবৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক চিন্তাধারা সংবলিত কলরবকে শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীদের অগ্রাহ্য করা উচিত। সিবিএসই-র এই সাম্প্রতিক নির্দেশ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত উন্নত ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করলেও শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীদের আরও গুরুদায়িত্ব থেকে যায়। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাগত উপকরণের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষীর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও নবোদয় বিদ্যালয় সমূহ সিবিএসই দ্বারা জারি উপরোক্ত নির্দেশ পালনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। উন্নত সুবিধা সমূহ লাভ ছাড়াও, মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন সব ভারতীয় শিশুদের একটি মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সনাতনী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সর্বদা তুলে ধরে এই দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। যে শিক্ষা শিশুদের সহজবোধ্য, যার আত্তীকরণ শিশুদের সহজসাধ্য— সেই শিক্ষা প্রণালীর প্রচলন হলে আরও ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত, সহনশীল ও সফল ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।

(লেখক ভারত সকারের পূর্বতন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং বর্তমানে আইএমএফের অধিকর্তা)

শোক সংবাদ

মালদহ জেলার গাজোল খণ্ডের সহ খণ্ডকার্যবাহ বিপুলবন্ধু বাগচীর মাতৃদেবী তপতী বাগচী গত ১১ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ৩ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী এবং স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক পাণ্ডুগ্রামের বাসিন্দা, উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমরেন্দ্র সরকার গত ১৪ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

সংসদে রাহুল গান্ধীর অভব্য আচরণ

গত ৯ আগস্ট ভারতীয় সংসদে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক চলছিল। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখার পর বলতে ওঠেন স্মৃতি ইরানি। অভিযোগ তখনই সংসদ কক্ষ ত্যাগ করার সময় বিরোধী দলের মহিলা সাংসদদের উদ্দেশে 'ফ্লাইং কিস' ছুঁড়েছেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের এহেন অসংসদীয় আচরণ অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে ঠিক পাঁচ বছর আগে আজকের মতো একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল অনাস্থা প্রস্তাব। সেদিনও সংসদে গরম ভাষণ দিয়েছিলেন রাহুল। ভাষণ শেষে জড়িয়ে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। তারপর রাহুলের কথা শুনে গোটা সংসদ থ হয়ে গিয়েছিল। রাহুল বলেছিলেন : 'আপনি আমাকে আলাদাভাবে গালাগাল করতে পারেন। কিন্তু আপনার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই। আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি। কংগ্রেস আমায় এই শিক্ষা দিয়েছে। এই ভাবনাই দেশ তৈরি করেছে। এই ভাবনা এতটুকুও ঘৃণা নেই। আমি আপনাদের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করব। আপনার ভিতরও এই ভাবনা নিয়ে আসব।' বিরোধীদলের এক প্রধান নেতার এই আচরণ দেখে হয়তো দেশবাসী ধন্য ধন্য করে উঠতে পারতেন।

কিন্তু তার পরেই বিস্মিত হয়ে গোটা দেশ দেখেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সাংসদ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে চোখের ইশারা করছেন রাহুল, যাকে চলিত বাংলায় বলা হয় 'চোখ মারছিলেন' রাহুল গান্ধী। দেশবাসী বুঝে গিয়েছিলেন, যাঁর বাবা-দাদারা এতবছর দেশ পরিচালনা করেছেন, সেই বংশের উত্তরাধিকারীর রাজনীতি করার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা না থাকুক, অভিনয়ে তিনি বিলক্ষণ সুপটু।

বলাবাহুল্য, রাহুল গান্ধীর এই আচরণ শুধু অসংসদীয়ই নয়, দেশের প্রধান বিরোধী দলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার পক্ষে এই আচরণ অত্যন্ত বেমানানও বটে। কিন্তু রাহুল গান্ধীকে এই কথা বোঝাবে কে? রাহুল গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে আসার কোনো অভিপ্রায়ই ছিল না। বিদেশে বেড়ে ওঠা, পড়াশুনা, চাকরি— তাঁর কোনো ইচ্ছাই ছিল না ভারতে আসার বা রাজনীতিতে নামার। এদিকে ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর গান্ধী পরিবারের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। রাজীব গান্ধীর পত্নী হিসেবে সোনিয়া গান্ধী সীতারাম কেশরীকে সরিয়ে ওই সময়ই কংগ্রেস সভানেত্রীর দায়িত্ব নেন। ২০০৪ সালে সোনিয়া গান্ধীই রাহুল গান্ধীকে একপ্রকার জোর করে রাহুল গান্ধীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। সোনিয়া বুঝেছিলেন গান্ধী পরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে যতই কংগ্রেসে তাঁর কদর থাক, তাঁর 'বিদেশিনী' পরিচয় তাঁর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

তাই ২০০৪ সালে যখন তথাকথিত ঔদার্য দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিলেন সোনিয়া, ধীরে ধীরে রাহুলকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে গান্ধী পরিবারের উত্তরসূরি হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেন। তাই কোনো যোগ্যতা ছাড়াই রাহুল মনমোহন সিংহের আমলের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হলেন। মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী থাকলেও রাহুল সুপার পিএমের ভূমিকা পালন করছিলেন। ২০১৩ সালে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন নিয়ে মনমোহন সরকার অর্ডিন্যান্স আনতে চাইলে সরকারের কেউ না হওয়া সত্ত্বেও সেই অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলতে বলার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন রাহুল।

> **২০২৩-এ রাহুলের ফ্লাইং কিস যেন ২০১৮-র রাহুলের চোখ মারার অ্যাকশন রিপ্লে। তারপর ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে কী হয়েছিল সবাই জানে, ২০২৪-এও দেশবাসী একই পথে দেশকে নিয়ে যাবেন।**

এই অনধিকার প্রশ্রয়েই শেষপর্যন্ত ২০১৪ সালে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদের মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেস-মুক্ত ভারত ও পরিবারতন্ত্র অবসানের ডাক দেওয়ায় কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হয়ে পড়ে। রাহুল গান্ধীকে সভাপতি করার পরও কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, বরং আরও ভরাডুবি হয়।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যর্থ স্বপ্ন নিয়ে রাহুল তাই তীব্র হতাশায় ভুগছেন এবং মোদীকে আক্রমণের লক্ষ্য করতে গিয়ে এই হতাশাজনিত একের পর এক অসংসদীয় কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন। এরই মধ্যে কট্টর রাহুল-অনুগামী বলে পরিচিত বিহারের কংগ্রেস বিধায়ক নীতু সিংহ আবার বলে বসেছেন, কেন পঞ্চাশ বছরের বুড়ি (পড়ুন স্মৃতি ইরানি) মহিলাকে ফ্লাইং কিস দেবেন রাহুল? তার জীবনে তো যুবতী রমণীর অভাব নেই! এই যদি রাহুল-অনুগামীদের মনোভাব হয় তাঁদের নেতার সম্পর্কে, তাহলে তো বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে কখনোই শোভনীয় নয়।

শুধু একটা কথাই পাঠককে স্মরণ করাবার, ২০২৩-এ রাহুলের ফ্লাইং কিস যেন ২০১৮-র রাহুলের চোখ মারার অ্যাকশন রিপ্লে। তারপর ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে কী হয়েছিল সবাই জানে, ২০২৪-এও দেশবাসী একই পথে দেশকে নিয়ে যাবেন। ▯

ভারতের বদনাম করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিব্রত করার নিরন্তর প্রয়াস চলছে

হরিয়ানার খট্টর সরকারকে এ বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদী সরকারকে দেশব্যাপী সজাগ থাকতে হবে।

আনন্দ মোহন দাস

হরিয়ানার নুহ শহরের এবং মণিপুরের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাবলী কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমন একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যাতে প্রমাণিত হয় দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে। সংখ্যালঘু সমাজের উপর আক্রমণের আওয়াজ তুলে মোদী সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেও সর্বদা চেষ্টা চলেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের বদনাম করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিব্রত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চলেছে। আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী তথা এনডিএ-কে পরাস্ত করতে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধারণা বা ন্যারেটিভের জন্ম দিয়ে একটি ইকোসিস্টেম কাজ করে চলেছে। পরিকল্পনামাফিক কিছুদিন আগে মণিপুরে অশান্তি সৃষ্টি করে বিদেশের মাটিতে ভারতকে বদনাম করা হয়েছে। এমনকী আমেরিকান সংসদের কিছু সদস্য ও ইউরোপীয় সংসদে এর প্রতিবাদ করে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে প্রতিবাদ করেছে। এরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু নিধন হলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় না কিন্তু খ্রিস্টান, মুসলমানদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে। এখানেই সন্দেহের তির তাদের দিকে থাকে। কিছু খ্রিস্টান ও মুসলমান সংগঠন অবৈধভাবে বিদেশি আর্থিক মদতে ভারতে এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ করে চলেছে এবং দেশে অস্থিরতার জন্ম দিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টায় থাকে।

বেশ কিছুদিন আগে দিল্লির শাহিনবাগে সিএএ-র বিরুদ্ধে যে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলেছিল, তদন্তে জানা গেছে এর পিছনে পিএফআই এবং এসডিপিআই নামে দুটি ইসলামি সংগঠনের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য ভাবে প্রত্যক্ষ মদত ছিল। বিদেশি শক্তিগুলি ভারতকে আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুর্বল ও নড়বড়ে সরকারই বিশেষ ভাবে তাদের কাম্য। সেজন্য দেশীয় এজেন্সির মাধ্যমে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক আন্দোলনে বিভিন্নভাবে এরা উৎসাহ দিয়ে থাকে। এই ধরনের আন্দোলনের স্বরূপ হলো, কৃষি বিল বিরোধী আন্দোলন, জেএনইউ আন্দোলন, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন, ভীমা-কোরেগাঁও আন্দোলন, হাথরস আন্দোলন ও শাহিনবাগ আন্দোলন ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আন্দোলনের পিছনে বিদেশি এজেন্সিগুলির আর্থিক মদত রয়েছে যা পরবর্তীকালে তদন্তে উঠে এসেছে। আগামীদিনে তদন্তে মণিপুর ও নুহ হিংসাত্মক ঘটনার পিছনে বিদেশি মদত প্রমাণিত হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইতিমধ্যে নূহ শহরের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে আলজাজিরা, বিবিসির মতো বিদেশি সংবাদমাধ্যমে যেমন অবিরাম প্রচার চলেছে, সেইরকম নিউইয়র্ক টাইমস লিখে চলেছে ভারতে সংখ্যালঘু সমাজ অসুরক্ষিত। আন্তর্জাতিক চক্র এবং কিছু মিডিয়া এই সংঘর্ষকে জাতি দাঙ্গা এবং মোদী সরকারের অপদার্থতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত রয়েছে। একটি ইকোসিস্টেম নীরবে কাজ করে চলেছে। আর এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা আগামী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে যে অনেক ঘটানো হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের আলোচনায় আমরা হরিয়ানার নুহ-র হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরও রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা। গত ৩১ জুলাই এই শহরে হিংসাত্মক ঘটনায় দু'জন হোমগার্ড-সহ পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রায় পঞ্চাশজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে এসপি, ডিএসপি ও পুলিশ ইন্সপেক্টরও রয়েছেন।

হরিয়ানার নুহ শহরটি হলো একটি মহকুমা শহর। ২০১১ জনগণনা অনুসারে এখানে মোট জনসংখ্যা ২,৮৭,১০১ জন। ২০১১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যার বিন্যাসে এটি হলো একটি মুসলমান অধ্যুষিত শহর। এই মহকুমায় মুসলমান জনসংখ্যা ২,১৯,৭১৬। জনসংখ্যার ৭৬.৫৩ শতাংশ। হিন্দু ৬৬.২৮৫ অর্থাৎ জনসংখ্যার ২৩.০৯ শতাংশ। বাকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। ২০২৩ সালে জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। নুহ জেলাকে মেওয়াটি মুসলমানদের হোমল্যান্ড বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে এখানে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি

অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা বেড়েছে এবং জনসংখ্যায় আরও ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। নুহ শহর জেহাদি তত্ত্বের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়েছে। নুহ জেলাটি ২০০৫ সালে তৈরি হয়েছে মূলত ফরিদাবাদ ও গুরগাঁও জেলা ভেঙে। নুহ বা মেওয়াট জেলা হিসেবেও একটি মুসলমান অধুষিত জেলা। জেলার জনসংখ্যা ১০,৯০,০০০ (২০১১ সেনসাস)। মুসলমান ৮৬২৬৪৭ (৭৯.২০ শতাংশ), হিন্দু ২২১৮৪৬ (২০.৪৭ শতাংশ), বাকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছেন। সেজন্য এই শহরকে মিনি পাকিস্তানও বলা হয়ে থাকে। বরাবরই এই শহর অপরাধমূলক কার্যকলাপে সংবাদের শিরোনামে থেকেছে। এখানে পুলিশের অনুমতিক্রমে গত ৩১ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছরের মতো শ্রাবণ মাসে ব্রজ মণ্ডল জলাভিষেকের জন্য শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তরা শিবমন্দিরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় জেহাদিরা শোভাযাত্রার ওপর হামলা চালায়। হামলা থেকে বাঁচার জন্য হাজার হাজার পুণ্যার্থী, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ নুহ শহরের নলহর মহাদের মন্দির চত্বরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মন্দিরকে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল জেহাদিরা। সেই সময় বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে আশপাশের বাড়ির ছাদ থেকে ও পাহাড়ের উপর থেকে কাঁচ, পাথর ছুঁড়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র ভক্তদের জখম করা হয়েছে।

আগুন লাগিয়ে গাড়ি, সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে দিতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকী গুলি পর্যন্ত চালানো হয়েছে। যার ফলে এখন পর্যন্ত ছ'জনের মৃত্যু ও পঞ্চাশজন আহত হয়েছে। পরবর্তীকালে গুরগাঁও-সহ কয়েকটি স্থানে হিংসা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা সরকারের দাবি এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ও বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্র। তদন্তের জন্য ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। হরিয়ানা সরকার আরও দাবি করেছে এখানে বস্তিগুলিতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিতে ভরে গেছে এবং এরা অসম হয়ে এখানে পৌঁছেছে। স্থানীয় মুসলমানরা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে এবং অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ২০২০ সালে বিচারপতি পবন কুমারের নেতৃত্বে মুসলমান অপরাধ প্রবণতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি কমিশন গঠন হয়েছিল। তাঁর রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন মেওয়াট শহরটির মানুষ পাকিস্তানকে পছন্দ করে এবং এই স্থানটি দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কবরের সমান। ইসলামিক অত্যাচারের আতঙ্কে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা ৪৮টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১৯টি এফআইআর দাখিল করার সাহস করেছে। অথচ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে নীরব।

এখানে বহু ধর্ষণের ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলেছে এবং অভিযোগ, সব ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। এই হলো এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় তদন্ত এজেন্সির (এনআইএ) তদন্তে এখানে হাওলা কারবারের গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং মহম্মদ সলমান, মহম্মদ সেলিম ও সাজ্জাদ আব্দুল ওয়ানি নামে তিনজন উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে। প্রত্যেকে ফতেহ-ই-ইনসানিয়ত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জড়িত যা পরিচালিত হয় উগ্রপন্থী হাফিজ সইদের সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার মাধ্যমে। নূপুর শর্মার মাথা কাটার জন্য দুই কোটি টাকা দেওয়ার কথা এখান থেকেই উৎপত্তি। ২০২০ সালের ২৬ অক্টোবর প্রকাশ্য দিবালোকে নিকিতা তোমর নামে এক কলেজ ছাত্রীকে তার কলেজের সামনে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মেয়েটির অপরাধ, তৌসিফ আহমেদ নামে এক মুসলমান যুবকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৯ জুলাই একজন পুলিশের ডিএসপিকেও বালি মাফিয়ারা লরি চাপা দিয়ে হত্যা করে। এই হলো এখানকার আইন শৃঙ্খলার অবস্থা।

এই নুহ মেওয়াট জেলায় অপরাধ প্রবণতার হার সম্ভবত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া মুসলমান যুবক দ্বারা মহিলাদের ধর্ষণ,খুন, রাহাজানি এসব এখনকার নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমান যুবকদের মাধ্যমে লাভজেহাদ ও ধর্মান্তরণের জাল এখানে পরিকল্পনা করে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। জেহাদিদেরও নিরাপদ আস্তানা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় হিন্দুদের দাবি, কেবলমাত্র বুলডোজার দিয়ে সমস্ত কিছু ভেঙে দিলে হবে না, তার সঙ্গে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদেরও বহিষ্কৃত করতে হবে। সমস্ত জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ নিশ্চিহ্ন করে অপরাধমূলক কাজ কঠোর হাতে দমন করতে হবে। নতুবা বিদেশি মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদের আওয়াজ উঠবে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি-সহ হিন্দুরা ধর্মীয় অধিকার হারাবে এবং নির্যাতনের শিকার হবে। সুতরাং হরিয়ানার খট্টর সরকারকে এ বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদী সরকারকে দেশব্যাপী সজাগ থাকতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মণিপুরে হিংসায় চীনা যোগ

দুই প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষের একই মত

ভারতের বামপন্থীরা, অদূরদর্শী রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা সমর্থিত টিএমসি, কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা অজান্তেই চীনাদের হাতের পুতুল হয়ে গেছে।

জেনারেল (অবসপ্রাপ্ত) শঙ্কর রায় চৌধুরী

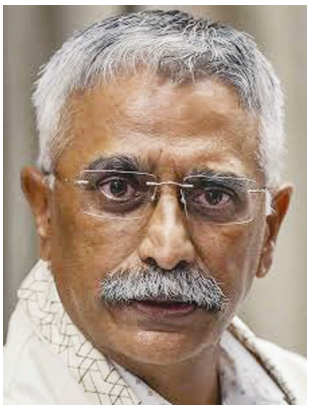

জেনারেল (অবসপ্রাপ্ত) নারাভানে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

সর্বত্র শোরগোল পড়েছে মণিপুর জ্বলছে বলে, কিন্তু সত্যিটা কী? সত্যি হলো বর্তমান বিজেপি সরকার মণিপুরে আফিমের ব্যবসা শেষ করে দিয়েছে। সরকার গত ৫ বছরে ১৮, ০০০ একরের বেশি জমিতে আফিম চাষ ধ্বংস করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী একে কুকি-মৈতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পরিণত করেছে। প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ খুন হচ্ছিল তখন সবাই চুপ ছিল। এরপর সেনাবাহিনী নামে। সন্ত্রাসীরা নিহত হয়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের বহু মন্দির ও উপাসনালয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তখনও সবাই চুপ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল করা হলো! অমনি সোনিয়া, উদ্ধব, মমতা, কেজরিওয়াল ও অখিলেশ যাদব মণিপুরের হিংসায় কাতর হলেন। কিন্তু ভোপালের ঘটনায় তাদের কোনো দুঃখ নেই যেখানে এক হিন্দু যুবককে চেন দিয়ে বেঁধে রাস্তা দিয়ে কুকুরের মতো হাঁটানো হয়েছিল।

মণিপুরের আদি অধিবাসী হলো মৈতেই তারা প্রধানত এবং মূলত হিন্দু। স্বাধীনতার আগে মণিপুরের রাজাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, অনেক দুর্বল মৈতেই রাজা প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার থেকে কুকি ও রোহিঙ্গাদের যুদ্ধের জন্য তাদের সেনাবাহিনীতে ডেকে পাঠান। ধীরে ধীরে কুকি হানাদাররা মণিপুরে তাদের বাসস্থান তৈরি করে পরিবার গড়ে তোলে। শীঘ্রই কুকি জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত আক্রমণাত্মক কুকিরা মণিপুরের পাহাড় দখল করে মৈতেই জনজাতিদের তাড়িয়ে দেয়। মৈতেইরা পালিয়ে মণিপুরের সমতল উপত্যকায় বসবাস শুরু করে।

বহিরাগত কুকি ও রোহিঙ্গারা মণিপুরের উঁচু পাহাড়ে আফিমের চাষ শুরু করে। মণিপুর মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত, চীন সীমান্ত খুব কাছে। মণিপুরের দিকে নজর দিতে আরম্ভ করে চীন এবং ভারত বিরোধী দলকে সাহায্য করতে থাকে। পাকিস্তানও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের মাধ্যমে মণিপুরে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ষড়যন্ত্র করেছে খ্রিস্টান মিশনারিরা। তারা মণিপুরের পিছিয়ে পড়া উপজাতি এলাকায় ২০০০-রও বেশি গির্জা তৈরি করে এবং দ্রুত ধর্মান্তরণ শুরু করে। মৈতেই উপজাতিদের অনেককে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল।

মণিপুরে ১৯৮১ সালে ভয়াবহ হিংসা হয়েছিল। ১০ হাজারেরও বেশি মৈতেই নিহত হয়, তারপরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সক্রিয় হন। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। শান্তি চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে মৈতেইরা সমতল ভূমিতে এবং কুকিরা বাস করবে উপরের পাহাড়ে।

ইতিমধ্যে দেশীয় মৈতেইদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ধীরে ধীরে কুকি, রোহিঙ্গা ও নাগা সম্প্রদায় মণিপুরের পাহাড়ে বড়ো আকারে আফিমের চাষ শুরু করে। হাজার হাজার জমিতে আফিম চাষ এবং কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য শুরু হয়। ফলে মাদক মাফিয়া ও সন্ত্রাসী সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যাপকভাবে অস্ত্রচালান হয়।

২০০৮ সালে আবার এক ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সোনিয়া গান্ধীর পরামর্শে মনমোহন সিংহ সরকার কুকি ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানরা মৈতেই জনজাতিদের সঙ্গে এক চুক্তি করে মণিপুরের পাহাড়ে আফিম চাষকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়। আফিম চাষের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা না নেওয়ার আশ্বাস দেয়। এরপর মণিপুর থেকে দ্রুত সারা ভারতে মাদক পাঠানো আরম্ভ হয়। মণিপুর হয়ে ওঠে মাদকের সোনালি ত্রিভুজ। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও মায়ানমারের সাহায্য নিয়ে মণিপুর থেকে উৎপাদিত আফিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পাঠায় চীন।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নজর ছিল গোটা ভারতে। যেখানে যেখানে ধর্মান্তরণ হচ্ছে, হিন্দুদের বিপদে পড়তে দেখা যাচ্ছে, যে রাজ্যগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্যগুলিকে চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ শুরু করেছে। অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ শুরু করে।

কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু কাশ্মীর ও অসমে সাফল্য পেয়েছে। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মণিপুরে প্রথমবারের মতো সাফল্য পায় এবং কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে আসা বীরেন্দ্র সিংহকে মুখ্যমন্ত্রী করে। মৈতেই সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সিংহ ৩০ বছর ধরে মণিপুরে রাজনীতি করছেন। তিনি মণিপুরের মৌলিক জনজাতি সমস্যা জানতেন। মোদী ও অমিত শাহ বীরেন্দ্র সিংহকে আফিম চাষ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। বীরেন্দ্র সিংহ হাজার হাজার একর জমির আফিম চাষ ধ্বংস করেন, যার কারণে কুকি, খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক, রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি চীনে ও পাকিস্তানে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তারা যে কোনোভাবে মণিপুরে আবার আফিম চাষ শুরু করতে চায়।

স্বাধীনতার আগে মৈতেইরা জনজাতি (এসটি) শ্রেণীভুক্ত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকার মৈতেই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এসটি শ্রেণী কেড়ে নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারি ও কুকি সম্প্রদায়কে এসটি করে। ১৯৪৯ সালের সংযুক্তীকরণ চুক্তির ফলে এটা হয়। এবার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭১ (সি) ধারায় মূলনিবাসী মানুষরা জনজাতি অঞ্চলে জমি কিনতে পারবেন না। কিন্তু কুকি-নাগারা পাহাড়ে তো একচেটিয়া অধিকার পেলই, আবার সমতল উপত্যকাতেও জমি কিনতে পারবে। বাইরের রাজ্য এমনকী মায়ানমার থেকে কুকিরা এসেও সেখানে জমি কিনতে পারবে। নাগা ও কুকি মণিপুরের জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ, তারা বেশিরভাগ পাহাড়ে বাস করে। মৈতেইরা জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ এবং ইম্ফল উপত্যকায় বাস করে। ইম্ফল উপত্যকা রাজ্যের মোট আয়তনের মাত্র দশ শতাংশ আর পাহাড়ের আয়তন ৯০ শতাংশ। মানে ৫৭ শতাংশ হিন্দু মণিপুরি জনজাতিরা বাস করে ১০ শতাংশ এলাকায় আর ৪৩ শতাংশ খ্রিস্টান কুকি নাগারা বাস করে ১০০ শতাংশ এলাকায়। এতে মৈতেইরা রেগে গিয়ে একটানা ক্ষোভ দেখাতে থাকে। যার জেরে মণিপুরে বারবার সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ২০১০ সালে মৈতেইরা হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করে এসটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি জানায়। ২০২৩ সালে হাইকোর্ট সেই দাবি গ্রহণ করে মৈতেইদের এসটিভুক্ত করার আদেশ দেয়। যেহেতু খ্রিস্টান ও কুকি বহিরাগতরা আফিম চাষ বন্ধ করা ও ধর্মপ্রচারকদের ধর্মান্তরণ বন্ধ করায় ক্ষুব্ধ ছিল, তাই তারা হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে মণিপুরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মণিপুর শীঘ্রই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে যাচ্ছিল। ২০১৪ সালে মোদী সরকার গঠিত না হলে চীন ধীরে ধীরে মণিপুর দখল করে নিত। কিন্তু খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মোদী সরকার মণিপুরে আদি ভারতীয়দের তাদের অধিকার দিতে শুরু করে। এই ব্যাপারটা বিরোধীদের অসন্তুষ্ট করে। গত ৭০ বছর ধরে মণিপুর কংগ্রেসের দখলে ছিল; তারা একের পর এক হিন্দু মৈতেইবিরোধী সিদ্ধান্ত নেয়। নিজেদের হাত থেকে মণিপুর যাওয়ার পর এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজ বন্ধ করায় ক্ষুব্ধ সমস্ত বিরোধী দল মণিপুরে সহিংসতার জন্য মোদী সরকারের গালমন্দ করছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মৈতেইদের তফশিলি উপজাতি (এসটি) মর্যাদা প্রদানের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কুকি-নাগা উপজাতি গোষ্ঠীগুলির বিক্ষোভ অন্যায্য। হাইকোর্ট ১৯ এপ্রিল মণিপুর সরকারকে বলে কেন তারা এক দশক ধরে এই জাতীয় প্রস্তাবের বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছে? তাই কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে তার অবস্থান স্পষ্ট করতে আদেশ দেয়।

কুকি উচ্ছেদ অভিযান ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছিল; মায়ানমার থেকে আগত উপজাতিদের দখলদারি হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং এটা উপজাতিবিরোধী হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এটা শুধুমাত্র কুকিদের মধ্যেই উদ্বেগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু অন্যান্য জনজাতিদেরও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে বসতি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহের চুড়াচাঁদপুর জেলা সফরের আগে কুকি জনতা সেখানে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়; সেখানে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। একটা জিমকে আংশিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে। চুড়াচাঁদপুর জেলায় জনজাতি ট্রাইব লিডার্স ফোরামের ডাকা 'সম্পূর্ণ বন্ধের' ১১ ঘণ্টা আগে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের, চুড়াচাঁদপুরের সাধারণ সম্পাদক ডি.জে. হাওকিপ বলেছেন, 'পার্বত্য জেলার বেশ কিছু এলাকাকে সংরক্ষিত বন ও অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং শত শত কুকি জনজাতিকে তাদের ঐতিহ্যবাহী বসতি এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কুকি জনগণের ক্ষোভ উচ্ছেদের জন্য নয়, বরং শত শত ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রদানে ব্যর্থতার জন্য। মার্চে কাংপোকপি জেলার থমাস গ্রাউন্ডে হিংসাত্মক সংঘর্ষ হয়, বিক্ষোভকারীরা ওই জমি দখলের বিরুদ্ধে সমাবেশ করার চেষ্টা করেছিল। পাঁচজন আহত হয়, যার পরে রাজ্য মন্ত্রীসভা কুকি-ভিত্তিক দুটি জঙ্গি সংগঠন— কুকি ন্যাশনাল আর্মি এবং জোমি রেভল্যুশনারি আর্মির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সাসপেনশন অফ অপারেশনস (এসওও) চুক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এসওও চুক্তি হলো একটি যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা যা এক দশকেরও বেশি আগে কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং কুকি দলগুলোর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। মন্ত্রীসভা পুনর্ব্যক্ত করেছে যে 'রাজ্য সরকার বন সম্পদ রক্ষা এবং আফিম চাষ নির্মূল করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে আপোশ করবে না'। ইম্ফলের উপজাতি কলোনি এলাকার তিনটি গির্জা সরকারি জমিতে 'অবৈধ নির্মাণ' হওয়ার জন্য ১১ এপ্রিল ভেঙে ফেলা হয়েছে, যাতে অসন্তোষ বেড়েছে।

জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী (প্রাক্তন সিওএএস) বলেছেন, 'আমি মনে করি যে মৈতেই ও কুকির মধ্যে উপজাতি সংঘর্ষে চীনা হস্তক্ষেপ আছে। ভারতের বামপন্থীরা, অদূরদর্শী রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা সমর্থিত টিএমসি, কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা অজান্তেই চীনাদের হাতের পুতুল হয়ে গেছে'। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নারাভানে বলেছেন, '...বিদেশি সংস্থার জড়িত থাকার কথা যা শুধু আমিই বলি না তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবে আমি বলব বিদেশিরা অবশ্যই জড়িত বিশেষ করে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে চীনাদের সহায়তা'। ▯

অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত না করলে দেশে অস্থিরতা চলতেই থাকবে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা সমগ্র দেশ জেনেছে। মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার হিংসা থামানোর জন্য চরম পদক্ষেপ হিসেবে যোগী আদিত্যনাথের পথ অনুসরণ করে পথে নামিয়ে দিয়েছেন বুলডোজার। ৪ আগস্ট সকাল থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত নুহ জেলার কিছু এলাকায় বুলডোজার অভিযান শুরু হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একের পর এক অস্থায়ী আস্তানা। দু'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার সাংবাদিক বৈঠক করে বুলডোজার অভিযানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'দাঙ্গায় জড়িতদের কড়া সাজা দেওয়া হবে। ভেঙে দেওয়া হবে তাদের ঘরবাড়ি, বাজেয়াপ্ত করা হবে তাদের সম্পত্তি।

হরিয়ানায় কেন এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলো তার ব্যাখ্যা হিসেবে হরিয়ানা সরকার দাবি করেছে, 'এইসব বস্তিতে বেআইনি ভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বসবাস করছিল। আগে তাঁরা অসমে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে হরিয়ানায় এসে সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছিল তারা। এদিন মহম্মদপুরে এরকম প্রায় ২৫০ বেআইনি অস্থায়ী বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই উচ্ছেদ অভিযান চালানোর সময় অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল গোটা এলাকায়।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত হরিয়ানার নুহতে হিংসার ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে। একাধিক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত একের পর এক হিংসার ঘটনায় ১৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৯৩টি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং শহরের অনেক জায়গায় ১৪৪ ধারা বলবৎ রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

ইতিপূর্বে সংবাদমাধ্যমের দৌলতে দেখা গেছে, উত্তর প্রদেশে বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অস্থায়ী বাসস্থান পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে। তাছাড়া ত্রিপুরা, অসম প্রভৃতি বিজেপি শাসিত রাজ্যে সরকারের তৎপরতায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা সেই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে স্থানীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আশ্রয় নেয়। তারপর তাদের সাহায্যে সরকারি খাস বা ভেস্ট জমি অথবা পিডব্লিউডি বা রেলের জমিতে অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে বসবাস শুরু করে। পরে স্থানীয় লোকেদের সহায়তায় রেশনকার্ড, ভোটারকার্ড, আধারকার্ড প্রভৃতি তৈরি করে নেয়। অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল স্থানীয় মুসলমান, মসজিদের ইমাম এবং ধর্মনিরপেক্ষ লেবেল সাঁটা রাজনীতিকরা। এরা স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্যে মোটা অঙ্কের অর্থের

বিনিময়ে কিছু সরকারি কর্মচারীদের মারফত সরকারি নথি পেয়ে থাকে। সেই নথির জোরে তারা দেশের নাগরিক বনে যায়।

শুধু হরিয়ানায় নয়, দেশের সর্বত্র এরা বসবাস করছে বিনাবাধায়, নিশ্চিন্তে। বিশেষ করে যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি বিরোধী দল ক্ষমতায় আছে সেখানে তো কোনো অসুবিধাই নেই, বরং জামাই আদরে থাকছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে রোহিঙ্গারাও সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকে। পুলিশ-প্রশাসন এসব দেখতেই পায় না।

আন্তর্জাতিক ইসলামি লবি বহুদিন ধরে চেষ্টা করছে ভারতকে ইসলামি দেশ বানাতে। যেহেতু যুদ্ধ করে ভারতকে ইসলামি দেশ বানানো যাবে না, তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ভারত দখল করতে চাইছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইলে শুধু জন্মহার বাড়িয়ে তা সম্ভব নয়। সে কারণে প্রয়োজন অনুপ্রবেশ। আর তার সঙ্গে দরকার ভারত বিরোধী কিছু রাজনীতিক যারা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে ভারতকে ইসলামি দেশে পরিণত করতে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এর প্রমাণ তো আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চোর, গুন্ডা, সন্ত্রাসবাদীকে পুলিশ ধরলে এই রাজনীতিকরাই সোচ্চার হয় বেশি, অথচ সেই লোকটি যখন সামান্য কারণে হিন্দু হত্যা করে তখন এরা সেটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। যেমন আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদী পুলিশের গুলিতে মারা গেলে এরা ভারত সরকারের মণ্ডুপাত করে কিন্তু কোনো সন্ত্রাসবাদীর হাতে অগুন্তি হিন্দুর মৃত্যুতে এরা দুঃখিত নয়।

দেশে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) পাশ হওয়ার পর সরকারি উসকানিতে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে দাঙ্গাবাজরা দেশের সম্পদ তছনছ করেছিল তাতে অনুপ্রবেশকারীদের সক্রিয় ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছিল। আবার কৃষক আন্দোলনের সময় দিল্লিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলেছিল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং বহির্দেশীয় অর্থের জোগানে। তাই ভারত সরকার যতদিন অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারবে, যতদিন অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে না পারবে ততদিন শুধু হরিয়ানায় নয়, ভারতের সমস্ত রাজ্যে এরা দাপিয়ে বেড়াবে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে।

কাজেই অনুপ্রবেশকারীদের শায়েস্তা করতে প্রথমেই দরকার একটা শক্তপোক্ত অনুপ্রবেশ বিরোধী আইন প্রণয়ন। যে আইনের জোরে দেশের যে কোনো প্রান্তে লুকিয়ে থাকা অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে। কেন্দ্র সরকার তো এখন লোকসভাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্যসভাতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না থাকলেও যে ক'জন সদস্যের প্রয়োজনে তা বর্তমান অবস্থায় পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অনুপ্রবেশ বিরোধী বিল সংসদে পেশ হলে বিরোধীরা হইহল্লা করবে সেটা জানা কথা। কিন্তু সেই হইহল্লাকে পাত্তা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন সেই। কেননা সবার উপরে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা। সুতরাং চলতি অধিবেশনেই এই বিল পেশ করা যায় কিনা কেন্দ্র সরকারকে তা ভেবে দেখতে হবে। তবে বিলে অনুপ্রবেশকারীদের ধরার ভার রাজ্যের হাতে ছেড়ে দিলে হবে না। কেন্দ্রের অধীনে এমন একটা স্বাধীন সংস্থা তৈরি করতে হবে যে সংস্থা শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে নিজেরাই দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারী ধরতে পারে রাজ্যকে উপেক্ষা করে। তারপর তাদের কেন্দ্রের হাতে তুলে দিলে কেন্দ্র তাদের দেশ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করবে। এ বিষয়ে অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। জওহরলাল নেহরুর ভাইপো বি কে নেহরু তখন ভারত সরকারের হয়ে ওয়াশিংটনে কর্মরত। এই সময় পাকিস্তান সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটন সফর করছিল। সেই দলে ছিলেন পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান গোলাম আহমেদ এবং অন্যজন সুরাবর্দির ভগ্নীপতি বিদেশ সচিব ইকরামুল্লা। একদিন রাতে ওরা দুজন মদ্যপান ও ব্রিজ খেলার জন্য বি কে নেহরুর বাসায় আসেন। গোলাম আহমেদ বি কে নেহরুকে বললেন, 'পণ্ডিতজী, তোমরা যে এই সেকুলার স্টেট বানিয়েছে, এ চলবে না।' বি কে নেহরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন চলবে না?' গোলাম আহমেদ উত্তর দিলেন, 'আমরা তোমাদের দেশে বিশ্বের বৃহত্তম পঞ্চম বাহিনী ঢুকিয়ে রেখেছি। আমরা তোমাদের বাঁচতেই দেব না।' এবার নেহরু বললেন, 'আমাদের দেশে চার কোটি মুসলমান আছে— আমরা তাদের নিয়ে কী করব?' গোলাম আহমেদ উত্তরে বললেন, আমরা যা করেছি তাই করো। কিছু মেরে ফেলো, কিছু তাড়িয়ে দাও, আর বাকিদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে নাও।'

আন্দোলনের নামে দেশের মধ্যে থাকা পঞ্চমবাহিনীর দাপট আমরা বারে বারে দেখছি। কখনও রেললাইন উপড়ে ফেলা, কখনও হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আক্রমণ করা ইত্যাদি দেখে ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় পঞ্চমবাহিনীর সক্রিয়তা। আর এই পঞ্চমবাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভোটভিখারি স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তারিক আলির কথা। পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী তারিক আলি তাঁর লেখা— 'ক্যান পাকিস্তান সারভাইভ?' গ্রন্থে লিখেছিলেন, ১৯৬০ সালে ভারতের জামাত-এ-উলেমা-এ- হিন্দের এক নেতা তাঁকে বলেছিলেন, 'ভারতে হিন্দু নেতা আর বিদ্বানদের যা অবস্থা তাতে ওরাই ভারতকে একটা মুসলমান দেশ বানিয়ে দেবে। এর জন্য মুসলমানদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে না।' এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি কেরালার মাল্লাপুরম জেলাকে বাম সরকারের মুসলমান জেলা বলে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে। আর পশ্চিমবঙ্গের কথা নাই-বা লিখলাম। গোলাম আহমেদের কথা শুনে সেদিন মুসলমানদের ওপর সেই সূত্র প্রয়োগ না করে সেকুলারদের ওপর যদি প্রয়োগ করা হতো, তবে দেশটা অনেক আগেই পরিষ্কার হতো।

অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে মাথা ঘামাতেই হবে। কেননা কেরালা রাজ্য ইসলামিদের কবজায় চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গও যাব যাব করছে। অসম, ত্রিপুরাও খুব একটা স্বস্তিতে নেই। মণিপুর জ্বলছে এমতাবস্থায় কেন্দ্র গভীরভাবে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে চিন্তা করুক এবং একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। ▯

মণিপুরে হিংসার বীজবপন করেছে কংগ্রেস সরকার

বরুণ মণ্ডল

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এখন একটাই কালো মেঘ মণিপুর বিক্ষোভ। কিন্তু আত্মভোলা এবং আত্মমুখী বাঙ্গালির কাছে মণিপুরের কাহিনি প্রায় সবটাই অজানা, আর যেটুকু তথ্য জানা তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অর্ধসত্য ও বিকৃত। মণিপুরে কেন আগুন জ্বলছে তার সঠিক তথ্য জানা দরকার। আসলে আজকের মণিপুরের অবস্থা প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেই ঘটতে পারে। এদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে। উপজাতি অধিবাসী অধ্যুষিত ভারতীয় সীমান্ত রাজ্য মণিপুর আজ এক বৃহৎ চক্রান্তের শিকার। সাম্প্রদায়িক স্লো পয়জনে মণিপুর রাজ্যটি আজ জর্জরিত।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে তছনছ করতে সাধারণত যে সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সব ক'টি কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে মণিপুর রাজ্যটিকে তছনছ করার জন্য। সমগ্র ভারতজুড়ে এক এক করে এভাবেই মণিপুর সৃষ্টি করা হবে। কী কী সেই কৌশল? প্রথমত, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং জঙ্গি কার্যকলাপ মণিপুর রাজ্যকে গ্রাস করছে। দ্বিতীয়ত, অস্বাভাবিক জাতিগত জনবিন্যাস গঠন। মণিপুর রাজ্যের মূল নিবাসী তিনটি যথা নাগা, কুকি ও মৈতেই। এই তিনটি জাতিই হিন্দু সমাজভুক্ত। কিন্তু তাদের সরলতা এবং আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইসলামিক জেহাদিরা বৃহত্তর অংশকে গ্রাস করেছে। এই তিনটি জাতির মধ্যে মৈতেই সম্প্রদায় হিন্দু বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। যাদের বেঁচে থাকার অস্ত্র শুধুমাত্র করতাল ও মৃদঙ্গ। বিগত দু' হাজার বছর ধরে মণিপুরের যে শিল্প সংস্কৃতি সারা বিশ্বের কাছে একটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে তা এই মৈতেই সম্প্রদায়ের হাত ধরে। নাগাদের আমরা দুর্ধর্ষ জাতি হিসেবে জানি। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নাগা রেজিমেন্টের কথাও আমাদের জানা। বাকি থাকলো কুকি সম্প্রদায়। এই কুকি সম্প্রদায়কে খ্রিস্টান মিশনারিরা সম্পূর্ণভাবে ধর্মান্তরিত করেছে।

মণিপুরকে সামনে রেখে মোদীর দুর্নাম করতে চাইছে। এটা নিশ্চিত যে মণিপুর কখনোই বিরোধীদের অস্ত্র হয়ে উঠবে না।

কংগ্রেসি শাসনে খ্রিস্টান মিশনারিদের বাড়বাড়ন্ত এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে পাহাড়ি মণিপুরে প্রায় ২০০০ চার্চ তৈরি করা হয়েছে যাদের একমাত্র কাজ অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা।

২০০৮ ও ২০১৪ সালেও জাতি দাঙ্গা ঘটেছে মণিপুরে। খ্রিস্টান মিশনারিদের চক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে পড়শি দেশ মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আগমন ঘটিয়ে মণিপুরের জনবিন্যাসে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। মৈতেইরা সাধারণত পাহাড়ি মণিপুরে থাকতো। এই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের অত্যাচারেই মৈতেইরা নিজভূমে পরবাসীর মতো সমতলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার চরিত্র বদল হয়েছে। সমতলে জীবিকার লড়াই করা তাদের কাছে কঠিন। এদিকে ধর্মরক্ষার সংকট তৈরি হয়েছে মিশনারিদের হাতের পুতুল কুকিদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে গিয়ে। খ্রিস্টান ধর্মে

ধর্মান্তরিত কুকিরা এমনিতেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী মৈতেইদের সহ্য করতে পারে না। ফলে ছোটোখাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মণিপুরের নিত্য ঘটনা। সেদিকে সারা ভারতবর্ষের কোনো নজর ছিল না। কারণ কংগ্রেস সরকার সেদিক থেকে নজর ঘোরাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ইদানীং মণিপুর বিজেপি শাসিত রাজ্য হয়ে উঠেছে। ফলে হিন্দুদের শুভাকাঙ্ক্ষী বিজেপি মৈতেইদের সমস্যা বুঝতে পেরেছে। অন্যদিকে মণিপুর উচ্চ আদালত মৈতেইদের সামাজিক সম্মান এবং সুবিধা রক্ষার্থে উপজাতি সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করা যায় কিনা সরকারের কাছে বিবেচনা করতে বলেছে। এখানেই ধর্মান্তরিত কুকি ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়েছে। কারণ সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়ে গেলে লড়াকু মৈতেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত, কংগ্রেস সরকার মণিপুরে আফিম চাষে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক শক্তির মদতে মণিপুর আফিম চাষের রমরমা ক্ষেত্র। ফলে মণিপুরের যুব সম্প্রদায় নেশাগ্রস্ত। মৈতেই বংশোদ্ভূত রাজা বীরেন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপির হাত ধরে মণিপুরের ধ্বংস বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এসে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখন অনেকটা মাটি ফিরে পেয়েছে গরিব রাজ্য মণিপুরের আদি বাসিন্দা মৈতেইরা। অফিম চাষ প্রায় খতমের দিকে। এবার সুযোগ পেয়ে ৭৬ বছরের অত্যাচারিত দুর্ধর্ষ উপজাতি মৈতেইরা সবকিছু উপেক্ষা করেই মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। রোঙ্গিরা, কুকি ভয়ে কাঁপছে মারছে। জবর দখল করা জমির উপর তিনশোর বেশি চার্চ জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফাদার-মাদার সব পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে। সবাই প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। রোহিঙ্গারা বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উলঙ্গ নারীর যে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যদিও তা পুরনো তথাপি সেটা মণিপুরের সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রতিচ্ছবি। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র হাতে কুকি সম্প্রদায়ের লোকজনদেরও দেখা গেছে। অন্যদিকে মৈতেই সম্প্রদায়ের মানুষ মণিপুরে কীভাবে কোণঠাসা সেটাও স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কারবারিরা মৈতেই সম্প্রদায়ের প্রতি অমানবিকতার বিচার না চেয়ে বিজেপি শাসিত অঞ্চলের নারী অসম্মানের পুরনো ভিডিয়ো তুলে ধরার চেষ্টা করছে। দুই নারীকে নগ্ন করে ঘোরানো এবং তার ভিডিয়ো ভাইরাল করা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু এই কাজটি করা হয়েছে সরল সাদাসিধে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী মৈতেই সম্প্রদায়কে অপরাধী সাজানোর জন্য। যে কাজটা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসি শাসন থেকে করা হয়েছে। এখন তা চরম আকার ধারণ করেছে।

মণিপুরের এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি মদত দিচ্ছে। মণিপুরের লাগোয়া রয়েছে মায়ানমার এবং কাছেই চীনের সীমান্ত। এই দেশগুলি ভারতবর্ষকে অস্থির করার জন্য সদা সচেষ্ট। সে কারণে বৈদেশিক শক্তি রোহিঙ্গা, খ্রিস্টান মিশনারিদের সহযোগিতায় বিক্ষোভের আগুন আরও বাড়িয়েছে। তবে মূল বিক্ষোভটা সংঘটিত হয়েছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বৈষ্ণব মৈতেইদের সজাগ হওয়ায়। শান্ত একটি জনজাতি হঠাৎ করে আন্দোলনমুখী হয়েছে, সেটা বিচ্ছিন্নতাকামী সংস্থা, ধর্মান্তরিত কুকি খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এখন ভারতে মৈতেই সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ আন্দোলনকে যেমন রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি বদনাম করছে তেমনি অশান্ত মণিপুরের দোহাই দিয়ে বিজেপি সরকারের সমালোচনা করছে। রাজনীতিতে এমন ব্যবসা চলতেই থাকবে। কিন্তু যারা ভারতের মঙ্গলকামী তাঁদের মণিপুরের এই বিক্ষোভ আন্দোলনের কারণ খুঁজতে হবে। মৈতেইদের এই আন্দোলন দেশ বা রাজ্যের বিরুদ্ধে নয় এ আন্দোলন যারা দেশবিরোধী তাদের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

ভারত দখল করার অন্যতম একটা পন্থা হলো কোনো স্থানের ডেমোগ্রাফি অর্থাৎ জনবিন্যাস বদলে ফেলা। অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত অনুপ্রবেশ এই জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার কৌশল। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা প্রথমে সংখ্যালঘু তাস খেলে। সংখ্যালঘু তাসে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে করতে যখন তারা সংখ্যাগুরু হয়ে যায় তখন তারা হোমল্যান্ডের দাবি করে। অখণ্ড ভারত খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে এই একই নিয়মে। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে গত কয়েকশো বছরে যত নতুন দেশ হয়েছে তার কারণও এই জনসংখ্যার ভারসাম্য বদল। এই একবিংশ শতকে এরকম সারা বিশ্বে যে ৩টি দেশের জন্ম হয়েছে তারও কারণ তাই। খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা হয়ে ইস্ট তিমোর; সার্বিয়া থেকে আলাদা হয়ে কসোভো; সুদান থেকে আলাদা হয়ে দক্ষিণ সুদানের জন্ম হয়েছে।

এগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে মণিপুরে কেন আগুন জ্বলছে। সব আগুনই কিন্তু ধ্বংসাত্মক নয়। ইদানীং মণিপুর কাণ্ড নিয়ে বিরোধীরা খুব মেতে উঠেছে। এখানেও তারা সফল হবে না। কারণ প্রতিটি বিষয়ের মতো এখানেও তারা মিথ্যে তথ্যের কারসাজি করছে। ভারত বিরোধী কিছু মিডিয়া চিরকাল এ কাজে তাদের সহযোগিতা করেছে। সেই সমস্ত মিডিয়ার হলুদ সাংবাদিকতা ভারতের সরলমতি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। আপাতত তাদের ভুল বোঝানো গেলেও, এখানেও ধর্মের কল বাতাসে নড়বে! কারণ সত্য চিরকাল অপরাজিত। দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরে হিন্দু তথা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী মৈতেই সম্প্রদায়কে কংগ্রেস সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত কুকি সম্প্রদায় দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার খবর গোপন ছিল। ঠিক গোধরাকাণ্ডের মতো অত্যাচারিতরা পালটা মার দিতেই বিরোধীরা রে রে করে তেড়ে আসছে। মণিপুরকে সামনে রেখে মোদীর দুর্নাম করতে চাইছে। এটা নিশ্চিত যে মণিপুর কখনোই বিরোধীদের অস্ত্র হয়ে উঠবে না। □

ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ

আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। তার আগে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্রিগেডে লক্ষ মানুষের সমাবেশ করতে চলেছে সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ। এটা কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ নয়। এই সমাবেশে হবে গীতা পাঠ। এই সমাবেশে উপস্থিত থাকতে পারেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও দ্বারকাপীঠের শংকরাচার্য। আমন্ত্রণ পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকেও। কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ না রাখতে আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী, সিপিএম রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রাজ্যের সমস্ত বিধায়ককেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে শ্রীমদ্ভগবত গীতা ও সনাতন ধর্ম দর্শন সমাদৃত হয়ে উঠেছে বিশ্বে। সনাতন ধর্মের দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান বিদ্যা, অধিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হিন্দুধর্মকে ঐতিহাসিক প্রগতিশীল চালিকা শক্তি বলে মনে করেন। ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা এবং আধুনিক পৃথিবীর প্রগতিশীলতার এক বিরল সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ হলেন একাধারে মানবতাবাদী এবং অন্যদিকে অধ্যাত্ম প্রেমী। এই জাতীয় সংমিশ্রণ সহসা চখে পড়ে না।' অধ্যাত্ম দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থ কবিতায় 'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঁঙ্কার ধ্বনি, হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরনি।' তাঁর দর্শনের মূল কথা শ্রীমদ্ভগবগীতার ১৩তম অধ্যায় ২৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে— সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎ স্ববিনিশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত বিনাশশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— মানুষের মনই হলো বিশ্ব প্রকৃতির জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেখানেই সমস্ত জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। তিনি ভারতীয় চিন্তা জগতে অনেক দিক থেকে আলোড়ন আনার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর দর্শন, শ্রীমদ্ভগবত গীতার ১৪তম অধ্যায়ের ৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে— সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়: সম্ভবন্তি যাঃ তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন— বিশ্বলীলার একটা বিশিষ্ট পর্বে চিৎশক্তির বিশেষ বিচ্ছুরণকেই আমরা প্রাণ বলে জানি। স্বরূপত সে-শক্তি অনন্ত নির্বিশেষে অব্যাহত-অখণ্ড-স্বভাবের নিত্যতৃপ্তিতে তার অবিচল তিষ্ঠা অর্থাৎ সে শক্তি সচ্চিদানন্দরই চিৎ তপঃ। তাঁর দর্শন শ্রীমদ্ভগবত গীতার ১৮তম অধ্যায়ের ৬১নং শ্লোকে বলা হয়েছে— ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। বর্তমান বিশ্বে ঘটমান ঘটনার প্রেক্ষিতে শ্রীমদ্গবদগীতার দর্শন অতীব গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ সংবাদপত্রে প্রকাশ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার শেষের রেশ ব্রাজিলে দাঙ্গা, প্যারিসে ভাঙচুর, বাংলাদেশে ১২ জনের মৃত্যু সামান্য খেলা নিয়ে। শ্রীমদ্ভগদগীতা পাঠ্য বিষয় হওয়া কেন প্রয়োজন? এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি সনাতন সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে লক্ষ মানুষের কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ একান্ত প্রয়োজন। এই সুবৃহৎ মহতী কর্মযজ্ঞকে আমি সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানাই। মন,প্রাণ ও আত্মার অভেদ দর্শন দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রীতি ও শান্তির আবহে এ শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ অতি মহতী উদ্যোগ।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
প্রথম খণ্ড, রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

পুলিশ ও প্রশাসন নিরপেক্ষ হোক

গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রাজ্য প্রশাসন চালানো হয় ও জনগণের পরিষেবা দেওয়া হয়। কিন্তু জনপ্রতিনিধি আর সরকারি প্রশাসন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। প্রশাসনের কাজ যেমন সাধারণ মানুষের পরিষেবাগুলি সঠিকভাবে প্রদান করা তেমনি কোনো সাধারণ মানুষের বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক রং এদের কাছে বিচার্য নয়। সবার জন্যেই সমানভাবে পরিষেবা দেওয়া উচিত। তাই প্রশাসনকে সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ হতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের বা জনপ্রতিনিধির হাতের রিমোট হলে চলবে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ জনপ্রতিনিধি, শাসকদল আর প্রশাসনের মধ্যে ফারাক খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রশাসনিক মঞ্চে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে বা রাজনৈতিক কাজকর্ম হতেও দেখা যাচ্ছে। বড়ো বড়ো অফিসারবাবুরা এতটাই শাসকদল অনুগত হয়ে পড়েছেন যে তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাব দেখা যাচ্ছে না। আসলে বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের ভাতা, সুযোগ সুবিধা, আমলা, বড়ো অফিসারদের দিচ্ছেন ফলে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা সরকারের অনুগত সৈনিকের মতো কাজ করছেন। বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকদলের সুপারিশ ছাড়া কোনোরকম কাজ হচ্ছে না। তাই সাধারণ মানুষ তাদের নায্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আজ রাজ্যে এত দুর্নীতির অভিযোগ তার জন্যে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা, পৌরসভা সবক্ষেত্রেই প্রসাশনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা মিলিত ভাবে সাধারণ মানুষের পরিষেবা প্রদানের বদলে দলতন্ত্র কায়েম করেছেন। পুলিশের কাজ নাগরিক সুরক্ষা প্রদান ও শান্তিশৃঙ্খলা

বজায় রাখা। পরিবর্তে এরা শাসকের অঙ্গুলিহেলনে কাজকর্ম করেন। বদলি, প্রমোশন ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে এদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না। সামান্য ঘটনা ঘটলেও শাসকের সুপারিশ ছাড়া এদের কাছে গেলে সহজে কাজ হয় না। তাই পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে আজকাল বেশি প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের করের টাকায় পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীদের মাইনে হয়। তাহলে সাধারণ মানুষের পরিষেবা প্রদানের জন্যে সবক্ষেত্রেই শাসকের সুপারিশ কেন লাগবে? তাঁরা নিরপেক্ষ হলে সরকারের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ হবে, দুর্নীতি কমবে, নাগরিক সুরক্ষা ও পরিষেবা বাড়বে। ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। দেশ ও বিদেশে বাঙ্গালিরা নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। আজ সেই গৌরব ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। রাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
গড়বেতা, পশ্চিমমেদিনীপুর।

ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ার গ্লোবাল ব্র্যান্ডে উত্তরণ

সম্প্রতি পাকিস্তানের বিখ্যাত পত্রিকা ট্রিবিউনের সম্পাদক শাহজাদ চৌধুরী তাঁর সম্পাদকীয়তে পরিষ্কার জানিয়েছেন, ভারত দশ বছরে মোদী জমানায় পৃথিবীতে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি রূপে বিকশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া সমস্ত পৃথিবীর কাছে উল্লেখযোগ্য ভাবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের রূপ নিয়েছে। পাশাপাশি পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারত পূর্বের চাইতে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ২০২৩ সালের জুন মাসে মোদী তিন দিনের সফরে যান আমেরিকায়। উদ্দেশ্য, কূটনৈতিক সম্পর্ককে মজবুত করা এবং কয়েক লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি টানা। পাশাপাশি দুদিনের সফরে মিশরে যান। মিশর বর্তমানে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রি সমূহের সভাপতি দেশ। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য ব্রিটিশদের হয়ে মিশরে গিয়েছিল যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে বহু সৈন্যের মৃত্যু ঘটলেও তাঁদের মৃতদেহগুলি ভারতে আনা সম্ভব হয়নি। মৃত যোদ্ধাদের স্মরণে সেখানে নির্মিত হেলিও ওয়র সিমেট্রিতে মোদীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং ভাষণ। কাজেই বলতেই হয়, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধকালীন আবহে রাশিয়ার সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি যুযুধান প্রতিপক্ষ আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় এবং ইসলামিক দুনিয়ার সভাপতি দেশ মিশরে আগমন— এই ত্রিভুজাকৃতি শক্তির কাছে দেশের নতুন প্রজন্মকে উন্নত ভবিষ্যৎ দেওয়াটাই মোদীর মূল লক্ষ্য, এরকমটাই অনেক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মনে করেন। বিগত এক দশক ধরে মোদী ম্যাজিক চলছে। ২০১৬-তে লন্ডনের মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে মোদীর মোমের মূর্তি উন্মোচিত হয়। ২০১৪ সালে বছরে আন্তর্জাতিক ফোর্বস পত্রিকা নরেন্দ্র মোদীকে ১৫ মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তুলে ধরে। আবার এই ফোর্বস পত্রিকাই মোদীকে ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮ সালের জন্য ৯ মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সনস্ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে মান্যতা দেয়।

২০১৬ সালের ৪ জুন আফগানিস্তান মোদীকে দিয়েছে— স্টেট ওর্ডার অব গাজি আমির আমানুল্লা খান। ২০১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্যালেস্টাইন মোদীকে দিয়েছে— গ্র্যান্ড কলার অব দ্য স্টেট অব প্যালেস্টাইন অ্যাওয়ার্ড। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ দপ্তর মোদীকে প্রদান করেছে চ্যাম্পিয়ান অব দ্য আর্থ অ্যাওয়ার্ড। ২০১৯ সালের ৪ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরাত দিয়েছে অর্ডার অব জায়েজ অ্যাওয়ার্ড। একই বছরে অর্থাৎ ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল রাশিয়া মোদীকে দিয়েছিল অর্ডার অব দ্য স্টেট অ্যানড্রিউ অ্যাওয়ার্ড যা ছিল রাশিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান। ২০১৯ সালে ৮ জুন মালদ্বীপ মোদীকে প্রদান করেছে অর্ডার অব দ্য ডিস্টিনগুইশড রুল অব নিশানা ইজ্জুদ্দিন। আর অতি সম্প্রতি মিশর দিয়েছে অর্ডার অব দ্য নাইল এবং ফ্রান্স দিয়েছে গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য লিজিয়ন অব অনার।

—নারায়ণ শঙ্কর দাস,
সোনারপুরহাট, উত্তরদিনাজপুর।

হিন্দু সমাজকে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে

হিন্দুরা প্রতিজ্ঞা করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তারা কোনো শিক্ষাই নেবে না। হিন্দুরা বারবার বিদেশি, বিধর্মী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, বিদেশি বিধর্মী শত্রুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে পদদলিত হয়েছে, নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত হয়েছে সাতশো বছর ধরে তবুও অতীত থেকে কোনও শিক্ষাই নেবে না।

মহম্মদ বিন কাশিম থেকে শুরু করে সবুক্তগিন, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, তৈমুর লং, বাবর, নাদির শাহ, আহমেদ শাহ আবদালি-সহ একাধিক বহিরাগত শত্রুর দ্বারা ভারত আক্রান্ত ও শাসিত হয়েছিল। হিন্দুরা নানাভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দু রমণীদের ওপর অত্যাচারের সীমা পরিসীমা ছিল না। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী রমণীদের স্থান হতো অত্যাচারী বাদশাহ, সুলতানদের হারেমে সারা জীবন যৌনদাসী হিসেবে। তারপর অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলে নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। এতদসত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে এতটুকু বিকার দেখা যেত না। এতদসত্ত্বেও হিন্দুরা এখনও বিশ্বাস করে চলেছে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুর্বৃত্তাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে...'।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার, চন্দননগর।

‘কর্মরতা পাত্রী চাই’

শবরী ঘোষ

ঘটনাটা শুনেছিলাম এক বান্ধবীর মুখে। তার বিবাহযোগ্যা দিদির জন্য তখন পাত্র দেখা চলছে। দিদি একজন স্কুল শিক্ষিকা, কর্মসূত্রে থাকেন উত্তরবঙ্গে। বিজ্ঞাপন দেখে এক পাত্রের পরিবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ছেলেটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার বাবা পণ হিসেবে দাবি করেছিলেন নতুন ফ্ল্যাট সাজাবার যাবতীয় ফার্নিচার, ১০ ভরি সোনার গহনা এবং পাত্রীর সম্পূর্ণ এক বছরের মাহিনা। এই অসম্ভব দাবি শুনে পাত্রীর বাড়ির লোকেরা বেঁকে বসে। তখন ছেলেটি ফোন করে জানায় যে, তার বাবা সেকেলে মানুষ। চিন্তাভাবনাও প্রাচীনপন্থী। কিন্তু সে আধুনিক এবং প্রগতিশীল। পণ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়ে তার ঘোর আপত্তি। সে নগদ টাকাপয়সা অথবা গহনা— এর মধ্যে কোনোটাই নেবে না। তবে পাত্রীর পরিবার যদি তাদের মেয়েকে উপহার হিসেবে কিছু দিতে চায় তাতে কোনো আপত্তি নেই।

ছেলেটির আশ্বাস পেয়ে বান্ধবীর পরিবার আবার তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ছেলেটির বাবা তখন বললেন যে, ছেলে তাঁকে অনেক বুঝিয়েছে। তিনি পুরনো দাবি থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছেন। নগদ টাকা পয়সা তিনি আর দাবি করবেন না। তবে পাত্রীপক্ষ বিয়েতে খাট, আলমারি, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি যে উপহারগুলি দেবেন তা যেন তাঁর ছেলের পরামর্শ এবং পছন্দ অনুসারে কেনা হয়। তাছাড়া বিয়ের সময় পাত্রীকে একটি স্ট্যাম্প পেপারে এই মর্মে লিখে সই করে দিতে হবে যে, মাইনের টাকা বিয়ের পর থেকে উত্তরবঙ্গে তার বাড়ি ভাড়া, খাওয়া ও স্কুলে যাতায়াতের খরচ ব্যতীত সম্পূর্ণ অর্থ কলকাতায় তার স্বামীর হাতে তুলে দিতে হবে। পাত্রীর পরিবারের তখন চক্ষু চড়কগাছ! বান্ধবীর দিদি তৎক্ষণাৎ ওই বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

কিছুদিন আগে টিভি-তে একটি নতুন ধারাবাহিকের প্রোমোতে দেখানো হচ্ছিল যে, বর্তমানে পণপ্রথা উঠে গেছে। তার পরিবর্তে পাত্রপক্ষের এক নতুন দাবির সংযোজন হয়েছে— ‘কর্মরতা পাত্রী চাই’। অর্থাৎ ভাবী বধূ তাঁর মাইনের পুরোটা অথবা অধিকাংশই স্বামীর

পরিবারের হাতে তুলে দেবেন। আমার মনে হয়, বধূ তার নিজস্ব উপার্জিত অর্থ কীভাবে ব্যয় করবেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার পরিচিত অনেক পরিবারে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও দেখেছি যে, একটি মেয়ের উপার্জনের সামান্যতম অংশটুকুও তার শ্বশুরবাড়ির মানুষজন দাবি করেননি। মেয়েটি স্বেচ্ছায় তাদের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করেছে। এটাই তো স্বাভাবিক সম্পর্ক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম।

কেউ কেউ বলবেন, বর্তমানে জিনিসপত্রের মূল্য এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, একটি ছেলের একার উপার্জিত অর্থে সংসার চালানো খুব কঠিন। তাছাড়া সংসার মানে তো সেখানে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কথাটা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু এটাও ভেবে দেখা উচিত যে, বর্তমান যুগে বহু পরিবারেই একটিমাত্র কন্যাসন্তান থাকে। সেই মেয়েটি হয়তো বিয়ের পরেও বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য তার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে চায়। পিতা-মাতার যদি পেনশন বা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো উপায় না থাকে তাহলে মেয়ের মাইনের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হবেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁরা জামাতা বা তার পরিবারের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন এই ভাষায়, ‘ভিখিরি কোথাকার! মেয়ের পয়সায় খেতে লজ্জা করে না?’ একটি ছেলে যদি তার মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে তাতে দোষ নেই, তাহলে মেয়েটির ক্ষেত্রে তা দোষ হবে কেন? পিতা-মাতার সেবা করার মতো পবিত্র কর্তব্যের ক্ষেত্রেও লিঙ্গবৈষম্য? তাছাড়া সংসার যখন দু'জনেরই তখন মেয়েটির পরিবারও নিশ্চয়ই তার অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনে চোখ পড়েছিল। একটি অত্যন্ত নামি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এক তরুণ, যার মাসিক উপার্জন হলো ৪২০০০ টাকা এবং পিতা সরকারি পেনশন-ভোগী, নিজের জন্য ‘কর্মরতা পাত্রী’ দাবি করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, সরকারি চাকুরে অগ্রগণ্য। বিজ্ঞাপনে নিজের দ্বিতল বাড়ির কথাও সগর্বে জানিয়ে দিয়েছেন। একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন— ‘Sky is the limit’। তাছাড়া, বেসরকারি সংস্থা থেকে তিনি নিজে কোনোদিন ছাঁটাই হয়ে গেলেও স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসী স্বরূপ স্ত্রীর নিরাপদ চাকুরিটা তো থাকছেই!

শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ের পরে অলসভাবে শুধু ঘরে বসে থাকবে কেন? তার বদলে সম্মানযোগ্য চাকুরি করতে পারে— এই ভাবনায় দোষের কিছু নেই। কিন্তু স্ত্রীর অর্থই যদি স্বামী বা তার পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে সেই পরিবারে মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই শ্রেয়।

ফুসফুসে জল জমা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেকের মুখেই শোনা যায়, ফুসফুসে জল জমেছে। এমনকী, এই অসুখ প্রাণসংশয়ও ডেকে আনে। কী এই অসুখ? আসলে, ফুসফুসের উপরে একটি পাতলা আবরণ থাকে, যাকে প্লুরা বলে, যা একটি পাতলা মেমব্রেনের মতো দেখতে হয়। ফুসফুস ও প্লুরার মাঝখানে খুব সামান্য পরিমাণ ফ্লুইড থাকে। কিন্তু বেশ কিছু গভীর অসুখের কারণে এই মধ্যবর্তী প্লুরাল স্থানে অনেক জল জমে যায় যাকে বলে প্লুরাল ইফ্যুশন বা সহজ ভাষায় বুকে জল জমা বলা হয়। আসলে ফুসফুসজনিত কিছু অসুখ থেকে এমন লক্ষণ প্রকাশ পায়। সঙ্গে হার্ট, কিডনি ও লিভারের সমস্যা থেকেও এমন হতে পারে।

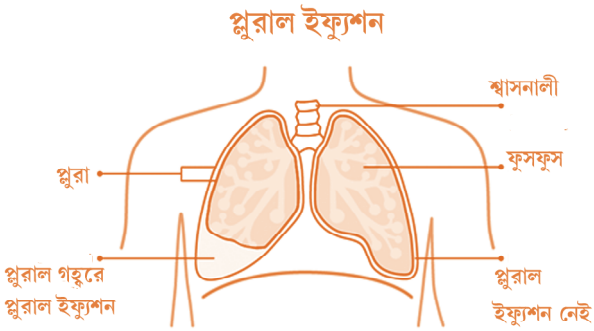

কেন এমন হয়?

দু'ধরনের পরিস্থিতিতে বুকে জল জমতে পারে। প্রথমত, যে জমা জলে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে অর্থাৎ প্রতি ডেসিলিটারে ৩ গ্রামের বেশি প্রোটিন থাকে তাকে এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফ্যুশন বলে এবং বুকে জমা জলে ৩ গ্রাম ডেসিলিটারের কম প্রোটিন থাকলে তাকে ট্রান্সউডেটিভ প্লুরাল ইফ্যুশন বলে।

১. এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফ্যুশনের প্রধান কারণ হলো সংক্রমণ অর্থাৎ ফুসফুসের যে কোনও সংক্রমণ থেকে নিউমোনিয়া হয়ে বুকে জল জমতে পারে। এছাড়া টিউবারকিউলোসিস বা টিবির কারণেও বুকে জল জমে। আরও একটি অন্যতম কারণ হলো টিউমার ও তার থেকে সৃষ্ট ক্যানসার বা মারণরোগ। ফুসফুস ও প্লুরার টিউমার ছাড়াও শরীরের অন্য অঙ্গে টিউমার হয়ে সেটি ছড়িয়ে পড়লেও বুকে জল জমে, যা মেটাস্টিটিক টিউমার নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে টিউমার থেকে ক্যানসার হলে বুকে জলের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকে। তাছাড়া অনেক সময় বুকে কোনওপ্রকার আঘাত লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হলেও বুকে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে হোমারেজিক প্লুরাল ইফ্যুশন হয়।

২. বুকে জমা জলে উপরোক্ত নির্ধারিত প্রোটিনের পরিমাণ কম থাকলে অর্থাৎ ট্রান্সউডেটিভ প্লুরাল ইফ্যুশনের কারণে সাধারণত শরীরের তিনটি প্রধান অঙ্গ হার্ট, লিভার ও কিডনি ফেলিওর বা এই তিনটি অঙ্গের কার্যকারিতার সমস্যা হয়ে থাকে। তবে কিডনির সমস্যাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী হয়।

বুকে জল জমেছে, কী করে বোঝা সম্ভব?

কোনো ইনফেকশনের কারণে বুকে জল জমলে একটা ব্যথা অনুভূত হয়, যা নিশ্বাসের সঙ্গে ও কাশি হলে বাড়ে এবং এই ব্যথা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। এরপর শরীরে জলের পরিমাণ বেশি হলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। রোগীর কাশি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে ওজন হ্রাস এবং খাবারে অনীহা থাকলে বুকে জল জমেছে ধরে নেওয়া হয় ও তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি :

চিকিৎসক স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেই কিছুটা অনুমান করতে পারেন। তারপর ফুসফুসের কোন অংশে জলের পরিমাণ কতটা সেই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার জন্য একটি চেস্ট এক্স-রে করানো বাধ্যতামূলক। খুব অল্প পরিমাণ জল থাকলে আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে বোঝা যায়। পরবর্তীতে ক্যানসার নিয়ে দ্বন্দ্বে থাকলে সিটি স্ক্যান করানো হয়। ট্রান্সউডেটিভ প্লুরাল ইফ্যুশনের ক্ষেত্রে এক্স-রের মাধ্যমে সমস্যা ধরা পড়লেও রোগীর পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি তথ্যের রেকর্ড খুব প্রয়োজনীয়, তাতে রোগীর হার্টের সমস্যা বা শ্বাসকষ্টের লক্ষণ সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। এই ক্ষেত্রে জল সাধারণত ফুসফুসের উভয় দিকেই থাকে অথবা রোগীর লিভার ফেলিয়োর হয়ে পেটে জল জমলে সেই জল বুকে চলে গিয়ে জমতে থাকে।

প্লুরাল অ্যাসপিরেশন অর্থাৎ পরীক্ষার পর বুকে ফ্লুইড পাওয়া গেলে প্রথম কাজ হলো জল বের করে টেস্ট করতে দেওয়া বা চিকিৎসার প্রথম ধাপে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে জায়গাটিতে জলের পরিমাণ আন্দাজ করে সেখানে সাময়িক অবশ করে একটা সিরিঞ্জের মাধ্যমে একটু ফ্লুইড নিয়ে টেস্ট করা হয়। এক্সুডেটিভ না ট্রান্সউডেটিভ, জলের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া, ফ্লুইডে টিবি বা ক্যানসারের জীবাণু লুকিয়ে তা অনুসন্ধান করা প্রভৃতি এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কোনও প্রকার জীবাণু না মিললে ফুলফুসে দাগ, টিউমার বা ক্যানসার আন্দাজ করে প্লুরাল বায়োপসি করা হয়। ফ্লেক্সি-রিজিড প্লুরোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে একটি ছোটো ফুটো করে দূরবীন ঢুকিয়ে সম্পূর্ণ প্লুরাল স্থানটি দেখা হয়। ফুসফুসের কোনো সন্দেহজনক জায়গা নজরে পড়লে সেখান থেকে বায়োপসি নেওয়া হয়। ফলাফল বুঝে তৎক্ষণাৎ রোগ অনুযায়ী পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু হয়।

বুকে ব্যথা, জ্বর কফের সঙ্গে রক্ত আসা, শ্বাসকষ্ট, খিদে কমের মতো লক্ষণ মাথাচাড়া দিলেই সত্বর এড়িয়ে না গিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করা আবশ্যক। অবহেলা করলে ফুসফুসে জল ভরাট হয়ে প্রাণ সংশয় হতে পারে। স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলা, তামাকজাত দ্রব্য বর্জন করা একান্তই প্রয়োজনীয়। প্রথম থেকে সতর্ক হলে সরকারি ওষুধ ডটস্-এর দ্বারা টিবির মতো অসুখও নির্মূল করা সম্ভব। □

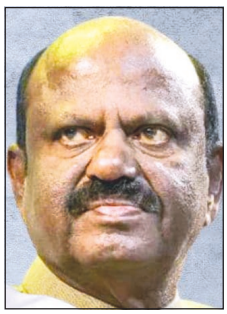

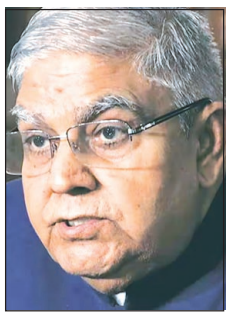

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত

এই অশিষ্টাচারের পাথেয় কোথায়?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রাজ্যপাল কে? আমরা রাজ্যবাসী ২০২০-র এপ্রিল মাস নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচ পাতার এক দীর্ঘ চিঠির থেকে নতুন করে অবগত হয়েছিলাম, রাজ্যপালের পরিচয় সম্বন্ধে। যে বহুলচর্চিত চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখছেন, 'মনে হয় ভুলে গিয়েছেন আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী আর আপনি মনোনীত রাজ্যপাল। আপনি আমার ও মন্ত্রীসভার পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু আমার ও মন্ত্রীসভার কাজে হস্তক্ষেপ কেন?' ওই চিঠি ছিল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের উদ্দেশে। কিন্তু চিঠির শব্দচয়ন যথেষ্ট ছিল একজন মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালের গরিমা ও পদমর্যাদাকে স্ব-অহংকার অবহেলা করার জন্য। এই রাজ্য যে প্রশাসনিক সভ্যতার অনুকূলতা হারিয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ওই চিঠি। অসংখ্য মন্তব্য, প্রতি পদে বিবাদ, সংঘাত, ভদ্রতার সর্বসংহারক আচরণ বার বার প্রতিষ্ঠিত করছে এরাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল তৃণমূলি কালচারের শিষ্টাচার-হীনতার রাশিভারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করছেন।

আমরা বাঙ্গালিরা ভরা মাঠে রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত দেখতে শিখিনি, ভাবতে শিখিনি। মুখ্যমন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক দলের অন্যান্যারাও বিগত তিন চার বছর যাবৎ যে তর্ক এবং সংহারী রূপে রাজ্যপালের দিকে প্রতিনিয়ত ধাবমান তার থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তৃণমূল হলো ময়ূরপুচ্ছ কাক। যারা ক্ষমতাটাই জেনেছে কিন্তু প্রশাসনিক সাংবিধানিক লজ্জাবোধ, আচারের পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে ধারণা নেই। রূঢ় অহংকারের ফলে তাদের মূঢ় দাম্ভিকতা রাজ্যপালের পদকেও রেয়াত করছে না। যদি বর্তমান রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস বনাম তৃণমূল পরিচালিত সরকারের লড়াই দেখি, তবে মনে হবে বিবাদের অপরিচিত সমুদ্রে আমরা খাবি খাচ্ছি। কোথায় এর সমাধান? অনাবিষ্কৃত সমাধান তট দূরদূরান্তেও গোচর হচ্ছে না। পরস্পর সংঘাতে প্রশাসনিক সদ্ভাব সৌজন্য তার অপঘাত সমাপ্তিতে দাঁড়িয়ে।

যতদূর মনে পড়ে, ড. সিভি আনন্দ বোস যেদিন রাজভবনে বর্ণপরিচয় করলেন, তার পর দিন যেতে পারল না— পুরাতন রূপে ফিরল তৃণমূল সরকার। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো সংঘাত চলছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বনাম রাজ্যপাল। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজের মন মতো ব্যক্তিবর্গকে উপাচার্য হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে চাইছেন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপালের নিয়োগ করা উপাচার্যরাই অধিষ্ঠিত হন। গত জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। কিন্তু সেই সকল উপাচার্যদের স্বীকৃতি দেবে না রাজ্য সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর একটা প্রতিক্রিয়া বেশ অদ্ভুত লেগেছে। উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে চরম সংঘাত শুরু হলো। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিলাম, রাজ্যপাল নিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের প্রথা লঙ্ঘন করে উপাচার্য নিয়োগ করছেন, সেক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে! ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে যাদবপুর, কলিকাতা, কাজী নজরুল, কল্যাণী, বিএড, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, সিধো-কানহো-বীরসা, বাঁকুড়া, ডায়মন্ড হারবার এবং সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের নির্দেশে

রাজভবনে রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে 'পিস রুম'।

অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হলে এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁরা যেন দায়িত্ব পালন করেন এমন নির্দেশযুক্ত স্বাক্ষরপত্র উপস্থিত হলে, আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষামন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে উপাচার্যদের দায়িত্ব প্রত্যাহার করতে বলেন! তিনি রাজ্যপালের প্রতি এত ভীত কেন? পূর্ণ ভাবে প্রশাসনিক পদ্ধতিতে কেন চিঠি মারফত বা সরকারি নির্দেশ মারফত উপাচার্যদের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকতে বলতে পারলেন না?

যে কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষ এ কথা স্বীকার করবেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান তলানিতে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার প্রাক্তন উপাচার্যকে ঘিরে যে ধরনের দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের তথ্য নজরে এসেছে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও অসংখ্য অনিয়ম, অস্বচ্ছতা ধরা পড়েছে, তার থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় এরাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও তৃণমূলীকরণ পূর্ণ হয়েছে। রাজনৈতিক আগ্রাসন থেকে শিক্ষামহলকে দূরত্বে রাখার জন্যই আচার্য হন রাজ্যপাল এবং তিনিই উপাচার্য নিয়োগের ভার নেন। শুধু এখানেই শেষ নয়। কিছুদিন আগে রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করলেও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে রাজ্য সরকার। রাজভবন এপ্রিল মাসে (৪-৪-২৩) এই রিপোর্ট চাইলেও তা দেড় মাস অতিক্রান্ত হলেও কোনও হেলদোল দেখা যায়নি রাজ্যের দিক থেকে। রাজভবন সচিবালয় রাজ্যকে এ মর্মে পুনরায় চিঠি করলে তখনই রাজ্যপাল হয়ে ওঠেন চোখের বালি।

এই তো ক'দিন আগে বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়েও রাজ্যপাল-রাজ্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকেই যে যুদ্ধ ছিল ঠাণ্ডা তা দিনে দিনে তপ্ত হচ্ছে। রাজ্য সরকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে ২৪ জুলাই থেকে বিধানসভার বাদল অধিবেশন বসাতে চেয়েছিল। তাই প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যপাল। যার উত্তর খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বা রাজ্যের মুখ্যসচিব লিখিতভাবে দিতে পারতেন। কিন্তু নবান্ন উত্তর দেবে না। মন্ত্রীসভার বৈঠক নবান্নে হয়েছিল। বাদল অধিবেশনও ২৪ তারিখেই হয়, কিন্তু তার আগে যে ভাবের বজ্রপাত রাজ্যপাল ও রাজ্যের মধ্যে ঘটেছিল তা প্রতিবারের মতো জানান দিয়েছিল আবহাওয়া কতটা তপ্ত। এমন একটিও বিষয় পাওয়া যাবে না যেখানে রাজ্য রাজ্যপাল পদের প্রতি সৌজন্য বজায় রেখেছে। যেদিন রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলো, সেদিনও উপস্থিত হলেন না মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি এবং আপত্তি অমান্য করেই এই দিবস পালন হচ্ছে তাই এত পারদ তপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস বলে নাকি কোনো দিন হয় না। এমন কথা ইতিহাসের কোথাও নেই। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাকি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যটাই রসাতলে যাবে। আমরা এতদিন বুঝতাম রাজনৈতিক ইগোটাই বড়ো। কিন্তু এই সংঘাত প্রমাণ করল ইতিহাসবোধ, স্বাজাত্যবোধটাও রাজ্য সরকারের বড্ডো কম। তাই অদ্ভুত যন্ত্র তন্ত্র যোগে হলেও এরা বিরোধিতা, কলহ করেই ছাড়বে। ঠিক একই আচরণ বিগতদিনে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন। যখন জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল, তখন রাজভবনে ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর পোর্ট্রেট উন্মোচন হলে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রীর দেখা মেলেনি। এতটাও যে প্রশাসনিক সৌজন্যের অভাব থাকতে পারে একজন মুখ্যমন্ত্রীর, তা মমতা ব্যানার্জির এক একটা উদাহরণ না দেখলে অনুমান করা যেত না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কালে রাজভবন থেকে পিস রুম, হেল্প লাইন নাম্বার হোক কিংবা দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট, রাজ্যপাল প্রতি সময়ই রাজ্যের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্কে ঠেকছেন। সম্পর্ক এতটাই তলানিতে যে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে হাজির হচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার বেজায় চটে গেছে রাজ্যপাল সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে অপসৃত করে ১৯৮৪-এর আইপিএস ব্যাচের প্রাক্তন সিবিআই কর্তা রাকেশ আস্থানাকে আসন দেওয়ায়। শুধু তাই নয়, রাজভবনের প্রেস সচিব শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাতে নবান্ন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

একজন রাজ্যপালকে আমরা কীভাবে দেখব? তিনি সুসজ্জিত গৃহে থাকবেন আর কিছু উদ্বোধনে হাজির হবেন? রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক সময়ই আমরা বিস্মৃত হই। রাজনীতির ওপর নিরপেক্ষতা প্রদানের জন্য রাজ্যপালের দায়িত্ব। রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে ভুলে গেলে চলবে না সংবিধান বেশ কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে একক ক্ষমতা দিয়েছে। যেমন, মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ, মন্ত্রিত্ব বাতিল, বিধানসভা বাতিল, বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ শুনতে বাধ্য নন।

১৯৮৮-র প্রিভেনশন অব করাপশন অ্যাক্ট মোতাবেক, কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে যদি প্রাথমিকভাবে দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপরতা না দেখান। তখন রাজ্যপালকেই এগিয়ে আসার অধিকার দেয় সংবিধান। মন্ত্রীমণ্ডলী মন্ত্রীর অপরাধের বিচার করারই এক্তিয়ার রাখে না। তখন সংবিধানের ২৩৫ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল কাজ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নন রাজ্যপাল। এবং সংবিধানের ১৬৩ ধারায় উল্লেখ রয়েছে মন্ত্রীমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নন রাজ্যপাল। তাই সিভি আনন্দ বোস যখন অ্যান্টি করাপশন সেল তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তখন রাজ্য সরকারের এত প্রতিক্রিয়ার কারণ কী? তাতে না আছে কোনো সাংবিধানিক জোর আর না আছে কোনো সৌজন্যরীতি।

তখন উলটে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার বলে ওঠে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধেই করাপশন চার্জ আনা উচিত। তবে এই সব নিরেট লক্ষ্মীহীন রুষ্ট হুংকারে হাসিই পায়। হাস্যকর এই যে, জগদীপ ধনকরের উদ্দেশেও তো তৃণমূল বলেছিল, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হোক। এরা কি সত্যিই জানে না একজন কর্মরত দায়িত্ব সম্পন্নকারী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এফআইআর করাটাই অসাংবিধানিক এবং কোনো আইনের অবকাশেই তা হয় না? বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মূল সমস্যা হলো জড়-মূঢ়-দাম্ভিকতা। যে কোদালে ওরা বিরোধীদের কোপন করে তাতেই রাজ্যপালকেও ঘায়েল করতে চায়। এদের নৈতিকতার সৌজন্যের শিথিল স্নায়ুকে যতই সাংবিধানিক আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করার চেষ্টা করি না কেন এরা সত্য মিথ্যা ঠিক ভুল নিজেরাই স্থির করার বদভ্যাসে মত্ত।

রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিতভাবে অবগত সংবিধানের ১৬৬ ধারা সম্বন্ধে। যেখানে রাজ্য সরকারকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা মনোনীত রাজ্যপালের নামেই প্রয়োগ করতে হয়। এবং ১৬৭ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকেই জানাতে হয়। প্রশাসনিক পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব 'মনোনীত' রাজ্যপালকেই জানাতে হয়। এত 'গেল গেল' রব উঠছে বর্তমান রাজ্যপাল এবং শিক্ষা দপ্তরে হস্তক্ষেপ বিষয়ে। তাহলে ঘুরে দেখা যাক জ্যোতি বসুর আমল। রাজ্যপাল এপি শর্মা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন সন্তোষ ভট্টাচার্যকে। 'মনোনীত' রাজ্যপাল কিন্তু সেদিনও 'নির্বাচিত' মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রস্তাবিত নামকে উপাচার্য পদ দেননি। সেদিনও জ্যোতি বসু সরকার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কমিউনিস্ট ভঙ্গিতে স্লোগান তুলেছিল— 'গদি ছাড় বাংলা ছাড়'। তারপর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান।

বছরের পর বছর রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার মনোমালিন্যে পশ্চিমবঙ্গ বেশ অভ্যস্ত হচ্ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আমল সেই মনোমালিন্যকে কুরুচিপূর্ণ সংঘাতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল। দেখে মনে হয়— রাজ্যপালের সঙ্গে কলহ করাটাই যেন সাংবিধানিক দায়িত্ব, প্রথা। রাজ্যপাল যেটাই নির্দেশ করবেন ঠিক সেটাই উদ্দেশ্যযোগে অমান্য করাটাই যেন প্রশাসনিক বল প্রকাশের পথ।

আজকে রাজ্য সরকার যতই কুরুচিকর আচরণ করুক, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র রাজ্যপালের উদ্দেশে টিপ্পনীযোগে 'আঙ্কেলজি' সম্বোধন করুক, ব্রাত্য বসু রাজ্যপালকে অবমাননা করে 'নৈরাজ্য'পাল কটাক্ষ করুক এবং আরও অসংখ্য কটাক্ষ শ্লেষ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই করুক— ভুলে গেলে চলবে না একদিন এই পশ্চিমবঙ্গেই 'মনোনীত' রাজ্যপাল ধরমবীরের ক্ষমতার প্রয়োগ। ১৯৬৭ সাল। যিনি বাংলা কংগ্রেসকে ফ্লোর টেস্টের সুযোগটাও দেননি। কারোর কোনো কথা না শুনে নতুন সরকারকে আচমকাই শপথে ডাকলেন। চলেছিল রাজ্যপাল বনাম স্পিকার লড়াই। আবার ১৯৬৯, যুক্তফ্রন্ট সরকার। তখন রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। আবার ফ্রন্ট শরিকে বনিবনা হলো না। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলেন। সিপিএম সেদিন কিছু শরিককে নিয়ে সরকার গঠন করতে চাইলে সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন 'মনোনীত' রাজ্যপাল। উল্লিখিত রাজ্যপালদ্বয় ঠিক কী ভুল সে বিচারের অধিকার আমার নেই, কিন্তু একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একাই রাজ্যের মালিক নন। তর্কের খাতিরে, রাজ্যপাল যদি স্বৈরাচারী হন তবে কি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কোনো সৌজন্য? নয়তো। এই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস শিখিয়েছে কেমন করে একগুঁয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হয়। এখানেও উদাহরণে রাজ্যপাল ধরমবীর। ৫ মার্চ ১৯৬৯, ধরমবীর যখন বিধানসভায় ভাষণ দিতে এলেন, সেদিন নিয়মানুযায়ী ভাষণ লিখেছিল রাজ্য সরকার। তাতে উল্লেখ ছিল, '১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর আমি অগণতান্ত্রিক ভাবে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে খারিজ করেছিলাম। সেই রাতের অন্ধকারেই বিধানসভায় সংখ্যালঘু এমন কোয়ালিশনের একটা সরকার বসিয়েছিলাম। এই কাজগুলো করা ভুল হয়েছিল। গত বিধানসভা ভোটে জনগণের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।' দুই ও তিন নং প্যারাগ্রাফে এই অংশগুলি ছিল। রাজ্যপাল ধরমবীর এক নং প্যারাগ্রাফ পাঠ করেই চার নং এ লাফ দেন। সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। বলেছিলেন, রাজ্যপাল আপনাকে সম্পূর্ণ ভাষণ পড়তেই হবে। এবং পরের দিন জনসংঘ, সিপিআই, সিপিএম এবং এসএসপি-র সব সদস্যরা দিল্লিতে রাজ্যপালের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে সরব হন। কিন্তু কটু বাক্যবাণে সেদিনও কেউ রাজ্যপালকে ব্যক্তিআক্রমণ করেননি। একজন সাংবিধানিক প্রধানের ক্রিয়াকলাপ যদি সত্যিই গ্রহণযোগ্য না হয় তার প্রতিকার ও প্রতিবাদ সাংবিধানিক উপায়েই করতে হয়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার প্রশাসনিক সাংবিধানিক পদক্ষেপকে রাজনৈতিক কোন্দলের সমকক্ষ ভেবে যা করছে তা তাদের অসুস্থ রুচি এবং পরিমিতিবোধের অজ্ঞতাই প্রতিনিয়ত স্পষ্ট করছে। রাজ্যপাল নামক পদটি যে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে এবং তা যে সার্বিক ভাবে দেখলে, বিচার ও ওজন করলে মন্ত্রীসভারও ঊর্ধ্বে। মুখ্যমন্ত্রী যদি ক্যাবিনেট তোরণের ভিত্তিপ্রস্তর হন তবে সেই রাজ্যের ওপর স্ববিবেচনায় কাজ করার স্বাধীনতা রাখেন রাজ্যপাল। এবং তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রের সেতুবন্ধনী। মনে রাখতে হবে, সংবিধানের ১৬৩ (২) ধারা। যেখানে বলা আছে সংবিধান বর্ণিত কাজ করার জন্য রাজ্যপালকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। নিশ্চিত ভাবে রাজ্যপালও মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্য পরামর্শ নেবেন (১৬৩,১) কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রাজ্যপালের প্রতিটা নির্দেশ সচেতন ভাবে অগ্রাহ্য করার অধিকার রাখে রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গে মূল সমস্যা অতি রাজনীতিকরণ। এমন একটা ক্ষেত্র অনুবীক্ষণে বহু কষ্টেও নিরীক্ষণ করা যাবে না যেখানে রাজনীতিকরণ হচ্ছে না। সেই রোগে এতটাই ক্ষয়প্রাপ্ত যে, রাজ্যপালের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্যাডারের মতো আচরণ করছে। এ এক এমন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যেখানে পদমর্যাদা যেন নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করলেই ভালো হয়। তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে একটাই জিজ্ঞাসা— এই অশিষ্টাচারের পাথেয় কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ও রাজ্যপাল

এক অন্তহীন দ্বন্দ্বের তত্ত্বতালাশ

বিমল শঙ্কর নন্দ

এ যেন এক অন্তহীন দ্বন্দ্বের সার্কাস চলছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। কেউ জানে না, এই দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়। একদিকে নির্বাচিত একটি সরকার, যার প্রধান হলেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে আছেন রাজ্যপাল, যিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও যিনি একেবারে ক্ষমতাহীন নন। সংবিধান বলেই বেশ কিছু ক্ষমতার অধিকারী। বাম আমলেও রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ বেধেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে অনন্ত প্রসাদ শর্মার সঙ্গে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধ, যার সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করা নিয়ে, তা এক তিক্ত আকার ধারণ করেছিল। ২০০৪ সালে নিযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের সুসম্পর্ক থাকলেও ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ, হিংসা এবং হত্যাকাণ্ডের পর রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। কারণ, নন্দীগ্রামে বাম প্রশাসন যে ভূমিকা পালন করেছিল, রাজ্যপাল কড়া ভাষায় তার নিন্দা করেছিলেন। নন্দীগ্রাম কাণ্ডকে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী 'হাড় হিম করা সন্ত্রাস' বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং বহুদিন এই শব্দগুচ্ছ মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। আবার কিছু রাজ্যপালের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল। যেমন ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহ, উমাশঙ্কর দীক্ষিত, সৈয়দ নুরুল হাসান, কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি প্রমুখ। তাদের আমলে অধিকাংশ রাজ্যপালের সঙ্গেই বামফ্রন্টের সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৮১ সালে নিযুক্ত রাজ্যপাল বি ডি পাণ্ডেকে বাম নেতারা প্রথমদিকে 'বাঙ্গলা দমন পাণ্ডে' নামে অভিহিত করতেন বটে, কিন্তু যে দু'বছর (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ - ১০ অক্টোবর ১৯৮৩) ভৈরব দত্ত পাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন, সেই সময়কালে মারাত্মক তিক্ততার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ভারতের কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলো নীতিগতভাবে রাজ্যপাল পদের অবলুপ্তি চায়। ফলে রাজ্যপালের সঙ্গে বাম সরকারগুলির বিরোধের সম্ভাবনা সবসময় থাকে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ১৯৭৭ থেকে ২০১১— এই ৩৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনকালে একটি দুটি ক্ষেত্র বা ব্যক্তি হিসেবে অনন্তপ্রসাদ শর্মা বাদ দিলে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালদের তেমন বিরোধ ঘটেনি। অথচ ক্ষমতায় আসার কয়েক বছরের মধ্যেই রাজ্যপালের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের বিরোধ শুরু হয়ে যায়। ক্রমেই তা তিক্ত হচ্ছে। প্রথমে কেশরী নাথ ত্রিপাঠী, তারপর জগদীপ ধনখড় এবং বর্তমানে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস— সকলের সঙ্গেই তৃণমূল সরকারের বিরোধ বেধেছে বা বেধে চলেছে, যার প্রভাব পড়েছে বাঙ্গলার রাজনীতি এবং প্রশাসনের ওপর। অথচ এই তৃণমূল যখন এরাজ্যের বিরোধী দল, তখন নন্দীগ্রাম কাণ্ডে রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর সমালোচনা থেকে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক ফয়দা তোলে তারাই। ইতিহাসের পরিহাস হলো সেই তৃণমূল কংগ্রেস যখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই বিরোধ শুরু হলো রাজ্যপালের সঙ্গে।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র সরে পশ্চিমবঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সম্পর্কে তিক্ততা দেখা যায়। সেই সময় মমতা অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী নাকি টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে হুমকির সুরে কথা বলেছেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন রাজ্যপাল ত্রিপাঠি। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা বাইরে না আনাই বাঞ্ছনীয়। আর রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যে ঘটে চলা অবাঞ্ছিত ঘটনা সম্পর্কে তিনি চুপ করে থাকতে পারেন না। এরপর বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের বিরোধ বাড়তে থাকে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে তাঁর অপসারণ দাবি করতে থাকে। এমনকী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজভবনকে বিজেপির পার্টি অফিসে পরিণত করার অভিযোগ তোলা হয়। তৃণমূলের মুখপাত্ররা রাজ্যপাল ত্রিপাঠীর সঙ্গে সঙ্ঘের

যোগের উল্লেখ করে রাজভবনকে আর এস এসের শাখায় পরিণত করার অভিযোগও প্রায়ই আনতেন। এছাড়া কমিউনিস্ট দলগুলোর কাছ থেকে ভাবনা ধার করে রাজ্যপালের পদটিকে অবলুপ্ত করার দাবিও তোলা শুরু করে তৃণমূল।

২০১৯ সালের ৩০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে জগদীপ ধনখড় শপথ গ্রহণ করেন। এরাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে সমর্থকরা পর্যন্ত ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ সম্ভবত শেষ হতে চলেছে। কারণ ধনখড় একসময় কংগ্রেস এবং জনতা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি বিজেপিতে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী কিংবা তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের ভাষায়, তিনি যেহেতু আর এস এস হার্ডলাইনার ছিলেন না, সুতরাং রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিরোধেরও সম্ভাবনা কম। কিন্তু বাস্তবে জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের তীব্র বিরোধ বাধে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৃণমূলের মন্ত্রী) বাবুল সুপ্রিয়কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হেনস্থা, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের কার্নিভালে তাঁকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অবহেলা (রাজ্যপালের ভাষায়), রাজ্যপাল যখন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করতেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রশাসনিক অসহযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধ অতি উচ্চগ্রামে ওঠে। বর্তমান রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে সুসম্পর্ক দিয়েই শুরু হলেও বিরোধ এবং বিতর্কের পুরনো ঐতিহ্য আবার ফিরে আসে। এবছর ২৬ জানুয়ারি রাজ্যপালের বাংলা শিক্ষার সূচনাপর্বে 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠান নিয়ে রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা এত উৎসাহ দেখিয়েছিলেন যে, অনেকে আবার ভাবতে শুরু করেছিলেন যে এবার রাজ্য সরকার, রাজ্যপাল সম্পর্কের এক নতুন যুগ বোধহয় আসতে চলেছে। সি ভি আনন্দ বোস রাজনীতির মানুষ নন, অবসরপ্রাপ্ত আমলা। তাই বিরোধ নাও বাধতে পারে। কিন্তু বাস্তবে বিরোধ বেধেছে অতি দ্রুত। রাজভবনে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক হিংসা এবং এ সম্পর্কে রাজ্যপালের কড়া মনোভাব, হিংসা থামাতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার তীব্র সমালোচনা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রাজভবনে 'পিস রুম' খোলা, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজের পছন্দমতো উপাচার্য নিয়োগ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে 'গ্রিভান্স সেল' খোলা— বিরোধের ক্ষেত্র ছড়াচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। এর আশু মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

এর আগেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার বিরোধ বেধেছে। ১৯৬৭ সালে রাজ্যপাল ধরম বীরের সঙ্গে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরোধ, ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের বিরোধ ইতিহাসের পাতা উলটে দেখলেই পাওয়া যায়। ২০১১ সালে তৃণমূল দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন এম কে নারায়ণন। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। তৃণমূল সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'লাল কার্ড' দেখানোর হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

সব রাজ্যপালের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের বিরোধ বাধল কেন? তৃণমূল দল এবং সেই দলের মন্ত্রীসভার বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। মনোনীত রাজ্যপাল তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন না। সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজ্যের শাসন বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজ করেন। কিন্তু বাস্তবে সংবিধানে রাজ্যপালের প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের এমন কিছু সুযোগ দেওয়া আছে, যা নিজের ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতিরও নেই। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী অনুযায়ী, ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। রাজ্যপালকে এই নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়নি। বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনো বিলে স্বাক্ষর না করে রাজ্যপাল তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন (অর্থ বিল বাদে)। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দিতে পারেন। এই রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রীসভার সঙ্গে কোনো আলোচনা তিনি করেন না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে উপাচার্য নিয়োগের ব্যানারে রাজ্যপালের ক্ষমতাকে বিচার বিভাগও স্বীকৃতি দিয়েছে।

সংবিধান রাজ্যপালকে সাক্ষীগোপাল বানায়নি। যে রাজ্যপাল সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকতে চান না তাঁর সক্রিয় ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। তার ওপর জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজ্য সরকারের প্রশাসন পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি নিয়ে যদি বিতর্ক তৈরি হয় তবে রাজ্যপালের সামনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। দুর্নীতি, ক্রমবর্ধমান হিংসা, শাসক ও বিরোধী দলের তীব্র সংঘাত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে রাজ্যপালের সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি করেছে।

তবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের বিরোধের একটি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটও আছে। সর্বভারতীয় রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটটিকেও অস্বীকার করা যাবে না। যেখানেই রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বিতর্ক দেখা দিচ্ছে সেখানেই রাজ্যপলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ বাধছে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলগুলি রাজ্যপালের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে।

কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্রই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলো আলাদা হলেও প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য প্রায় এক। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী এবং দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যত বেশি আসবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থাগুলোর চাপ যত বাড়বে দ্বন্দ্ব ততই তীব্রতর হবে। কারণ, শাসকদল এই দ্বন্দ্বকে ঢাল করেই বাঁচার চেষ্টা করবে। দুর্নীতিকে আড়াল করতে এই দ্বন্দ্বকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে। ২০২৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে আবার অধিষ্ঠিত হলে এই দলগুলির সামনে সংকট আসবেই। দুর্নীতি, পরিবারবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনসাধারণ আরও সক্রিয় হবে। তাতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আঞ্চলিকতাবাদী ভাবনাগুলি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তাই এই দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার শেষ চেষ্টা চলছে। ■

মালদহে শিশুমন্দিরের অভিভাবক ও মাতৃসম্মেলন

গত ৫ আগস্ট মালদহ নগরের বদ্রীনারায়ণ সরস্বতী শিশুমন্দিরে অভিভাবক ও মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কমলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপহরানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অভিভাবিকা পিঙ্কি সরকার। আবৃত্তি পরিবেশন করে ছোটো বোন সোহিনী রায়। সংগীত পরিবেশন করে বোন আসরিন পারভিন। নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে তৃতীয় শ্রেণীর বোন সুপ্রীমা ঘোষ।

প্রস্তাবিক বক্তব্য রাখেন আচার্য তাপস শুকুল ও শঙ্কর চৌধুরী। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন স্বামী তাপহরানন্দ মহারাজ এবং তরুণ কুমার পণ্ডিত। অভিভাবক ও মায়েরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরেশচন্দ্র সরকার ও সোনালি কুণ্ডু।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ৬ আগস্ট বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় সিউড়ি অরবিন্দপল্লী নিবাসী শ্রীমত্যা অভয়া রায় মহোদয়াকে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শ্রদ্ধার সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীমত্যা রায়কে মাল্যভূষিত করেন অনুভবী শ্রীমতী কল্পনা বিষ্ণু। শাশুড়িমাতার পা ধুয়ে পূজা করেন তাঁর বড়ো বউমা শ্রীমতী রুপালি রায়। নামাবলি, বস্ত্র, ফল, মিষ্টান্ন ও গীতাগ্রন্থ দেন শ্যামলি দত্ত ও সুজাতা বিষ্ণু। মানপত্র পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। পঞ্চ প্রদীপে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সংবাদপাঠক মিলন চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, মালতী ঘোষ, সুরূপা দত্ত ও কাবেরী রায়। আবৃত্তি করেন দীর্ঘয়ী রায়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অধ্যাপিকা চৈতালি মিশ্র। পরিবারের পক্ষে ধন্যবাদ জানান গৃহকর্তা তাপস রায়। শান্তিমন্ত্র দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

খড়্গপুরে দক্ষিণবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত মার্গদর্শক মণ্ডলের সম্মেলন

গত ৫ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত মার্গদর্শক মণ্ডলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের গোলবাজারস্থিত গুজরাটি মিত্রমণ্ডল ধর্মশালায়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলের দক্ষিণবঙ্গের মুখ্য সন্ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, মহাউদ্ধারণ মঠের শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রিষড়া প্রেমমন্দিরের পূজ্য স্বামী নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, তারাপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী হংসানন্দজী মহারাজ, আলমবাজার মঠের স্বামী কমলেশানন্দ পুরী, খড়্গপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের স্বামী বামন মহারাজ, দীঘা শ্রীচৈতন্য মঠের স্বামী ভক্তি কেবল হরিজন মহারাজ, খড়্গপুর যোগানন্দ মঠের মোহন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি, পরমানন্দ মিশন জুনা আখড়ার স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি, মহানির্বাণ মঠের শ্রীমৎ সর্বানন্দ অবধূত, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় মহামিলন মঠের স্বামী পরাশর রামানুজ, কাঠিয়াবাবা আশ্রমের শ্রীমৎ বাঁকেবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা, আর্য সমাজের স্বামী ঋতানন্দ সরস্বতী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী পরম্পরার স্বামী বোধানন্দ গিরি, আদ্যাপীঠের স্বামী তেজস্বানন্দজী মহারাজ। সাধ্বীদের মধ্যে ছিলেন সাধ্বী খনা মা, পরিব্রাজিকা অর্পিতা মা, পূজ্যা মহর্ষিণী মা এবং পূজ্যা নিত্যময়ী মা। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক বিজয় পাতর, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ বিশ্বজিৎ দাঁ, মেদিনীপুর বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী বাদল দাস।

এই সম্মেলন বিশেষ করে গত ২৪,২৫, ২৬ মে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মাগদর্শক মণ্ডল বৈঠকের অনুবর্তী প্রয়াসের জন্য আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় বৈঠকে ঠিক হয়েছিল আগামী ১ থেকে ৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শৌর্য জাগরণ যাত্রায় সারা দেশের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গেও ৪টি রথ সমস্ত জেলা পরিক্রমা করবে, তাতে জেলার প্রমুখ সাধুসন্ত বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ দেবেন। এরকমই ১ থেকে ৫ ডিসেম্বর সামাজিক সমরসতা ও হিন্দু সংস্কার সংস্কৃতির মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি জেলার প্রতিটি প্রখণ্ডে সন্ত প্রবাস যাত্রা হবে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য সমস্ত মত-পথ-সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীরা সংগঠিত হয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন।

সম্মেলনে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে দেড়শোর বেশি সাধুসন্ত ও সাধ্বী অংশগ্রহণ করেন। পরে সকলেই শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমা করে একটি ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেন।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

কামারপুকুর-জয়রামবাটিতে লোকপ্রজ্ঞার পঞ্চদশ অনুভব দর্শন

অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় পুণ্যভূমি কামারপুকুর-জয়রামবাটিতে গত ২৯-৩০ জুলাই দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো অনুভব দর্শন কার্যক্রম। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকপ্রজ্ঞার দেড়শোজন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিনিধিদের কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের ভক্তনিবাসেই থাকা ও প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমদিন পায়ে হেঁটে ঠাকুরের জন্মস্থান, পাঠশালা, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করা হয়। দ্বিতীয়দিন ২৫টি গাড়িতে শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মস্থান জয়রামবাটি এবং পাশাপাশি কুড়িটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিভ্রমণের পর ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র ঠাকুরের পাঠশালায় শুরু হয় সমবেত অনুষ্ঠান। লোকপ্রজ্ঞা ছাত্রশক্তির পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র, দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা পরিবেশন করে।

অনুভব দর্শনের দুদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক রঘুনন্দনজী এবং পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটি মঠের পূজ্য মোহন মহারাজ, স্বামীজী গবেষক সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. অরিজিৎ সরকার প্রমুখ। ঠাকুর-মা- স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের বক্তব্য, আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করে।

বারাসাতে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ৬ আগস্ট বারাসাত নগরে সক্ষম দক্ষিমবঙ্গের প্রাণদা প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাঃ সুকল্যাণ ঘোষ, সত্যভারতী প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শেখর কাঞ্জিলাল, প্রণবকন্যা আশ্রমের প্রধানা মামণি। শিবিরে ৩২জন রক্ত দান করেন। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক এই রক্ত সংগ্রহ করে। শিবিরে স্থানীয় কার্যকর্তা, বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং স্থানীয় নাগরিকরা উপস্থিত থেকে উৎসাহ দান করেন।

মানব কল্যাণার্থে পূজিত হন বৈদিক দেবতাগণ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

'দেব' শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যেই দেবতাদের স্বরূপ প্রকটিত হয়ে আছে। দ্যোতনার্থক দীব্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় যোগে দেবশব্দের উৎপত্তি হয়। দেব শব্দের উত্তর তল্ প্রত্যয় যোগে দেবতা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং দেব ও দেবতা— দুটি শব্দই একই অর্থ বোঝায়। অর্থাৎ দ্যোতনামা বা আলোকময়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ঐশীভাব কল্পনার দ্বারা আকার ও নিরাকার দেব-দেবী বা দেবতাগণের আবির্ভাব। সুপ্রাচীন কালের ঋষিদের বিশ্বাত্মবোধের সম্পূর্ণতা থেকে, পরম সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা থেকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিব্যপ্ত করে যিনি বিরাজ করছেন তাঁর প্রতি চরম কৃতজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বৈদিক দেবতা। বৈদিক দেবতাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যে তাঁরা আলোকের অধীশ্বর। তাঁরা মানুষকে পার্থিব চেতনার স্তর থেকে ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করেন। তাই মনের ভিতরে থাকা দেবত্বের উন্মোচন হলেই মানুষের নবজন্ম হয়। নিরুক্তকার যাস্ক ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোক— এই তিন স্থানভেদে তিনজন মূল দেবতার কথা বলেছেন। ভূলোক বা পৃথিবীতে অগ্নি; অন্তরীক্ষলোকে বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকে সূর্য। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখিত বাকি দেবতারা হলেন এই তিন মূল দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং কর্মের নামান্তর মাত্র।

অগ্নি। পৃথিবী স্থানীয় দেবতা হলেন অগ্নি। তিনি মানুষের অনেক কাছের, অনেক নিকট সম্পর্কের দেবতা। অগ্নিদেব পুরোহিত, তিনি একাধারে হোতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। ঋগ্বেদের সূক্তসংখ্যা বিচারে অগ্নি হলেন দ্বিতীয় প্রধান দেবতা। অগ্নি দু'শোটি সূক্তে মুখ্যদেবতা; এছাড়া অন্যদেবতার সঙ্গে যুগ্মভাবে স্তুত হয়েছেন। তিনি মর্ত্যে দেবগণের দূত। যজ্ঞে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশে যা আহুতি দেওয়া হয় অগ্নিই তা দেবতাদের কাছে নিয়ে যান। দেবগণকে তিনি যজ্ঞস্থলে আবাহন করে নিয়ে আসেন। অগ্নিকে 'কুমারীগণের অধিপতি' বলা হয়। তিনি সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকারী, তাই তাঁকে প্রদক্ষিণ করেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। অগ্নি 'গৃহপতি'— গৃহে প্রজ্বলিত থেকে সমস্ত বিপদ হতে গৃহস্থদের রক্ষা করেন। বৈদিক ঋষিদের অগ্নি স্তুতিতে তাঁর তিনটি জন্মরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে, যথা— বিদ্যুৎরূপে আকাশে, পৃথিবীতে ও জলে।

ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ২৫০ সূক্তে স্তুত হয়েছেন যিনি তিনি নিরুক্তকার যাস্কের মতে অন্তরীক্ষের স্থানীয় দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রশব্দের ব্যুৎপত্তিও ইন্দ্‌ধাতু থেকে, যার অর্থ— বর্ষণ। ইন্দ্র দ্যাবা পৃথিবীর সন্তান। ঋগ্বেদে অদিতিকে মাতা এবং সোমকে পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদে ইন্দ্রের মায়ের নাম একাষ্টকী। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি থেকে ইন্দ্রের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্রের পত্নী, অথর্ব ও যজুর্বেদে শচীকে ইন্দ্রের পত্নী, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাসহাকে ইন্দ্রের পত্নী বলা হয়েছে। বজ্র তাঁর অস্ত্র। জলবর্ষণ, বৃত্রবধ, সর্বাধিক মন্ত্রভাজনত্ব এবং সর্বপ্রকার বলকর্ম— ইন্দ্রের কাজ।

সূর্য। 'চিত্রং দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা

দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং/সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।' ঋগ্বেদে (১/১১৫/১) দেবতাবৃন্দের মধ্যে সুবর্ণকান্তি তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সূর্যদেবতার মহিমাকে স্বতন্ত্রভাবে— স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের আত্মারূপে এবং মিত্র, বরুণ ও অগ্নির দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত জগতের চক্ষুঃ স্বরূপে পূজিত করা হয়েছে। সূর্যের রথের বাহন সাতটি অশ্ব। ওই সাত অশ্ব বিশ্বের কল্যাণের জন্য সূর্যকে বহন করে। যজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদে সূর্যকে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ বলা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যবাহনেরা অর্থাৎ সূর্যের রশ্মি জলীয় অংশ টেনে নেয় বলে— তাদের 'হরিৎ' অর্থাৎ 'রসহরণশীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দিবসপুত্র' সূর্য প্রতিদিন দৃষ্ট এবং অতিপ্রত্যক্ষ মহান দেবতা, যিনি অদিতির পুত্র। সূর্য এক, অদ্বিতীয়। কিন্তু কালভেদে তিনি কখনও সবিতা, কখনও পূষর্ণ, কখনও মিত্র, কখনও-বা বিষ্ণু।

পূষর্ণ। 'পূষ্' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ পোষণ, পোষক, পুষ্টিদাতা। ঋগ্বেদে মোট আটটি সূক্তে সম্পূর্ণভাবে পূষা দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। জটা-দাড়ি-গোঁফ বিশিষ্ট, স্বর্ণবর্ণের বর্শা তাঁর অস্ত্র, একটি পেচক এবং একটি অঙ্কুশ তাঁর নিত্যসঙ্গী। ছাগ তাঁর বাহন। তিনি দন্তহীন। ঘৃতমিশ্রিত যবের ছাতু তাঁর প্রিয় খাদ্য। তিনি সৌরমণ্ডলীর অন্যতম দেবতা।

মিত্র। ঋগ্বেদের অন্যতম সৌরদেবতা হলেন মিত্র। তিনি সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বরুণের সঙ্গে একত্রে স্তুত হন— 'মিত্রবরুণা'। আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে— হে আদিত্যমিত্র— বলেও বন্দনা করা হয়।

বরুণ। বরুণ শব্দটি বৃ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এই ধাতুর অর্থ আবৃত করা। আবরণকারী আকাশই বরুণ দেবতার স্বরূপ। বরুণ ঋতের রক্ষক, জলের অধিপতি।

অশ্বিনৌ বা অশ্বিনীদ্বয়। যমজ দেবতা রূপে বেদে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁরা বিবস্বান্ ও সরণ্যর পুত্র। তাঁরা দেবতাদের চিকিৎসক। অনেকের মতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রাক্‌বৈদিক সময়কালের প্রাচীন দেবতা।

মরুদ্‌গণ। অন্তরীক্ষলোকের গণদেবতা। একত্রে স্তুত হন। ঋগ্বেদে ৪০টি সূক্তে তাঁদের স্তুতি করা হয়েছে। তাঁরা মেঘ থেকে বৃষ্টি আনয়ন করেন। তাঁরা ইন্দ্রের সখা।

পর্জন্য। ঋগ্বেদে তিনটি সূক্তে স্তুত হওয়া অন্তরীক্ষলোকের অন্যতম দেবতা। বৃষ্টি দেবতা রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি।

সোম। ঋগ্বেদের সমগ্র নবমমণ্ডলে ১৪৪টি সূক্তে সোমই একমাত্র স্তবনীয় দেবতা। যাস্কাচার্যের মতে মুজবান্ পর্বতের শীর্ষে সোমলতার প্রাপ্তিস্থল ছিল বলে সোমকে 'মৌজবত' বলা হয়েছে।

রুদ্র। আর্য, অনার্য, অন্ত্যজদিগের রক্ষক, পালক এবং উপাস্য দেবতা রূপে পূজিত। জটাধারী সুবর্ণকান্তি তাঁর রূপ। রথে বিচরণ করেন। ধনুর্বাণ ও বজ্র তাঁর অস্ত্র। তিনি 'উগ্র', 'পুরুষঘ্ন', 'তিগ্মায়ুধ', ওষধিপতি রূপে ঋগ্বেদে তিনটি সূক্তে এবং যজুর্বেদে 'শতরুদ্রীয়' স্তবে সর্বময় আধিপত্যে কীর্তিত হয়েছেন।

যম। মৃত্যু এবং মৃতের দেবতা। আত্মার তিনিই আশ্রয় দাতা। তিনি বিবস্বান্ ও সরণ্যর পুত্র। সরমাবংশীয় দুটি কুকুর এবং পেঁচা যমের দূত। ঋগ্বেদে মোট তিনটি সূক্তে তিনি স্তুত হয়েছেন।

ঊষা। দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঊষা ঋগ্বেদে কুড়িটি সূক্তে স্তুত হয়েছেন। সূর্যদেব তাঁর প্রণয়ী। ঊষাদেবীর পশ্চাতে সূর্যদেব গমন করেন। নিদ্রা থেকে ঊষা অখিল জীবজগৎকে জাগরিত করেন। প্রেরণাদাত্রী ঊষা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন। রাত্রির অন্ধকারকে তাঁর জ্যোতি দিয়ে নাশ করেন।

রাত্রি। ঊষার ভগিনী রাত্রি। রাত্রি হলেন আকাশ দুহিতা। রাত্রি জ্যোতির্ময়ী। সমস্ত অন্ধকারকে আচ্ছাদিত করে তিনি আগমন করেন। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র তাঁর ভূষণ। তাঁর আবির্ভাবে কর্মব্যস্ত জগৎ নিদ্রামগ্ন হয়। নানাভাবে তিনি সৌভাগ্য প্রদান করেন। বীরপুত্র লাভ, হিংস্র প্রাণী ইত্যাদির জন্য বৈদিক ঋষিরা রাত্রিদেবীর স্তব করেছেন।

সরস্বতী। ঋগ্বেদে সরস্বতী প্রধানত জলদেবী। সরস্বতী নদী বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্র। ঋগ্বেদের আপ্রীসূক্তে ভারতী-ইড়া-সরস্বতী— এই দেবীত্রয় একত্রে বাগ্‌দেবীরূপে স্তুত হয়েছেন। ভারতী দ্যুলোকস্থবাক্, ইড়া বা ইলা, বাক্য বা পৃথিবী। সরস্বতী অন্তরীক্ষস্থ বাক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হন। তিনি সত্যবাক্য এবং শোভনবুদ্ধির প্রকাশিকা।

পৃথিবী। এককভাবে ঋগ্বেদের একটি সূক্তে এবং পিতা দ্যৌ-এর সঙ্গে একত্রে পৃথিবী স্তুত হয়েছেন। তিনি জীবের আশ্রয়দাত্রী, অন্নদাত্রী। সৃষ্টির পিতা হলেন দ্যৌ ও মাতা হলেন পৃথিবী।

অরণ্যানী। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ১৪৬নং সূক্তটি চিন্ময়ী বৈদিক অরণ্যানী দেবীর সৌন্দর্যমণ্ডিত স্তুতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অরণ্যানী সকলের আশ্রয়দাত্রী। হিংস্রপ্রাণী অথবা শান্তচিত্তের ঋষিগণের পরম আশ্রয় স্থান অরণ্যানী। অন্যে হিংসা না করলে অরণ্যানী স্বয়ং কারুর প্রতি হিংসা করেন না।

আপদেবতা। জলের অসীম উপকারিতা ও অনন্তমহিমাই জলাধিষ্ঠাত্রী রূপী বৈদিক দেবী আপদেবতাকে দেবত্বের আসনে বসিয়েছে। সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতী, পরুষ্ণি প্রভৃতি নদী আপদেবতারই মহিমান্বিত রূপ ঘোষিত করেছে।

ঋগ্বেদের অন্যান্য দেবী হলেন ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী, রুদ্রপত্নী রোদসী, অগ্নিদেবতার স্ত্রী অগ্নায়ী, বরুণপত্নী বরুণানী। গর্ভরক্ষণ ও সুপ্রসবের জন্য প্রার্থনা জানানো হয় রাকা, সিনীবালী, অনুমতি, কুহু প্রভৃতি দ্যুলোকের দেবীদের কাছে। দেবমাতারূপে অদিতিকে মান্য করা হয়। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫নং সূক্তে ঋষিগণ বিশ্বদেবতার স্তব উচ্চারণে পৃথক্‌ভাবে দেবস্তুতিতে এক সমন্বয়সূত্র গেয়ে উঠে বলেছেন— মহাদ্দেবানামসুরত্বমেকম্— অর্থাৎ সমস্ত দেবদেবীর একই মহৎ বল। বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বমানবের হয়ে সেই সুপ্রাচীনকালে দ্যোতনাময় বা আলোকময়তার স্তুতি সূক্তে বন্দিত বা পূজিত করে গেছেন মানবকল্যাণ স্থিতির কামনার্থে। □

শ্রীখাটু শ্যাম রূপে বর্বরিকের মস্তক আজও পূজিত হয়

জয়ন্ত শীল

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই যুদ্ধ একটাই— ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের। মহাভারতে পাণ্ডব-কৌরব যুদ্ধও এর ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাস পাণ্ডব কৌরবের ১৮ দিনের যুদ্ধকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নাম দিয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবরা ন্যায়ের পক্ষে এবং কৌরবরা অন্যায়, অর্ধমের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। অধর্ম যতই শক্তিশালী হোক তার পরাজয় নিশ্চিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়ী এবং কৌরবরা পরাজিত হয়েছিল।

পাণ্ডব পক্ষ ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে ১৮ দিন যুদ্ধ করলেও কৌরবরা নানান সেনাপতি নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। কৌরবদের পক্ষে প্রথম দশদিন নেতৃত্ব দেন ভীষ্ম পিতামহ, এগারো থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত গুরু দ্রোণাচার্য। ষোলো ও সতেরো কর্ণ। অন্তিম দিনে শাল্যের নেতৃত্বে কৌরবরা পরাজিত হয় এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মহাভারতের যুদ্ধ আঠারোদিন পর্যন্ত হয়তো স্থায়ী হতো না অথবা যুদ্ধের ইতি হতো একটু অন্যরকম ভাবে যদি মহান বর্বরিক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন। বর্বরিক হলেন ঘটোৎকচ ও মৌরবি পুত্র। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক। মাতা মৌরবির কাছে বর্বরিক অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণ মহারথীদের কাছে একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন— যে মহারথী নিজ ক্ষমতার বলে কে কত দিনে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে পারবে। এই প্রশ্নের উত্তরে রথীমহারথীরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সময় বলেছিলেন, কিন্তু একই প্রশ্নের উত্তরে বর্বরিক যা উত্তর দিয়েছিলেন তা শুনে স্বয়ং কৃষ্ণ হতবাক হয়েছিলেন। বর্বরিক বলেছিলেন যে তিনি কয়েক মুহূর্তে নিজ ক্ষমতার দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতি টানতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার কাছে এই বিশেষ ক্ষমতার কথা জানতে আগ্রহী হলেন।

বর্বরিকের হাতে 'তিনবাণ' নামক এক বিশেষ অস্ত্র ছিল। সেই অস্ত্রের দ্বারা কয়েক মুহূর্তেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব। এই অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো এই অস্ত্র শত্রু ও মিত্র মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নিত করে এবং মিত্রকে নিরাপদে রেখে মুহূর্তে শত্রু নিধন করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তার বিশেষ অস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছের সমস্ত পাতা ধ্বংস করতে বললে বর্বরিক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পাতা ধ্বংস করেন এবং তাঁর বাণ এসে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে ঘুরতে থাকে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ চাতুরি করে একটি পাতা নিজ পায়ের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এই ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণ বর্বরিকের বাণের সত্যতা ও ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বর্বরিককে প্রশ্ন করেন যুদ্ধে তিনি কোন পক্ষ নিতে চান তার পিতা, পিতামহের পক্ষ না কৌরব পক্ষ। বর্বরিক ক্ষণিকের মধ্যেই উত্তর দেন তিনি তার মায়ের কাছে কথা দিয়েছেন যে দুর্বলদের পক্ষ নেবে। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনে তার থেকে দূরে যান এবং ক্ষণিকের মধ্যে সাধুর রূপ ধারণ করে বর্বরিকের নিকট আসেন। সাধুরূপী নারায়ণ বর্বরিকের কাছে প্রার্থনা করেন যে সে বর্বরিকের কাছে যা চাইবে বর্বরিক দেবে কি না? বর্বরিক এক কথায় স্বীকার করে সাধু যা চাইবে বর্বরিক তাই সাধুর চরণে সমর্পণ করবে। সাধুরূপী কৃষ্ণ বর্বরিকের খণ্ডিত মস্তক দাবি করেন। সাধুর এহেন আশ্চর্য দাবি শুনে বর্বরিক সাধুর আসল পরিচয় যানতে চায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ ধারণ করলে বর্বরিক নিজ মস্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণে দান করার আগে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করতে চান। শ্রীকৃষ্ণ আশীর্বাদ করলে বর্বরিক নিজ মস্তক কেটে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তার মস্তক একটি পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসেন, সেই স্থান থেকে বর্বরিক সমস্ত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা যুদ্ধজয়ের কারণ জানতে আগ্রহী হলে শ্রীকৃষ্ণ মহান বর্বরিকের কথা, তার অসীম ক্ষমতার কথা ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য বর্বরিকের বলিদানের কথা পাণ্ডবদের বলেন। এরপর পাহাড় থেকে বর্বরিকের মাথা নামিয়ে আনা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা মতো রূপবতী নদীতে বর্বরিকের মাথা সলিল সমাধি দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ বর্বরিককে আশীর্বাদ করেন তার এই মহান বলিদানের জন্য যে সে 'শ্যাম' রূপে পূজা পাবে। কলিযুগ শুরু হওয়ার পর রাজস্থানের খাটুগ্রামে বর্বরিকের মস্তক পাওয়া যায়। খাটুর রাজা রূপসিংহ চৌহান স্বপ্নাদেশ পান 'খাটুশ্যাম' মন্দির নির্মাণের। বর্বরিকের মস্তক আজও পূজিত হয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী মানুষ আজও মহান বর্বরিকের মস্তক 'খোটু শ্যামজী' নামে পূজা করেন।

তিব্বতে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দীপক খাঁ

ভাবতে আমাদের ভালোই লাগে যে অতীশ দীপঙ্কর প্রাচীন বিক্রমণিপুর রাজ্যের রাজপুত্র। অতীশের জন্ম আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। পণ্ডিতদের মতে ঢাকা বিক্রমপুরই ছিল সেই বিক্রমণিপুর। বজ্রযোগিনি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। লৌকিক নাম চন্দ্রগর্ভ। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর। দীপঙ্করের পিতার নাম রাজা কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম রানি প্রভাবতী। তিন পুত্রের মধ্যম পুত্র চন্দ্রগর্ভ— পরবর্তীতে মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর।

জন্মের পরেই অতীশ সম্পর্কে জ্যোতিষীরা নানা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা এবং রানি মধ্যম পুত্রের ব্যাপারে অতিশয় যত্নশীল হন। অসাধারণ মেধাবলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধীত বিদ্যা আয়ত্ত করেন। এমনকী তন্ত্রবিদ্যাতেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথম জীবনে একবার তর্কবিদ্যায় একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতকে তিনি পরাস্ত করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে অতীশ বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কৃষ্ণাগিরি মঠে পণ্ডিত রাহুল গুপ্তের কাছে। এরপর ওদন্তপুরীর আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। দীক্ষা গ্রহণের বারো বছর পরে তিনি ভিক্ষুব্রতী হন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিতের কাছে বোধিসত্ত্বব্রতে দীক্ষিত হন। এর পরবর্তী ১২ বছর শাস্ত্রপীঠের জন্য অতিবাহিত করেন সুবর্ণদ্বীপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে। সেখান থেকে তাম্রদ্বীপ বা সিংহলের পথে ফিরে আসেন মগধে। মগধের নৃপতি তখন মহীপাল। তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানান বিক্রমশীলা মহাবিহারের সহাচার্য পদ গ্রহণের জন্য। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন স্বমহিমায় দীপ্যমান, সেই সময়েই বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেউ বলেন রাজগৃহের ছ' মাইল উত্তরে আধুনিক বড়গাঁওয়ের অন্তর্গত শিলা গ্রামের বিক্রমশীলার অবস্থান। অন্য মতে ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটা গ্রামে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিক্রমশীলাও ছ'টি কলেজে বিভক্ত ছিল। এখানে চার সম্প্রদায়ের প্রায় দু' হাজার ভিক্ষু অধ্যয়ন করতেন। ভারতবর্ষে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে অষ্টম শতাব্দীতে ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধীশ্বর ধর্মপাল দেব। তাই ধর্মপাল দেবের সময় থেকেই পাল রাজবংশের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এই বংশই নালন্দাবিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা বিদ্যালয় পরিচালনা করত। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমশীলা বিহারের অধিনায়ক নিযুক্ত হতেন। দীর্ঘ চারশো বছর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত এবং ভারতের বাইরে জ্ঞান বিতরণ করেছে। বুদ্ধদেবের সিদ্ধপীঠস্থান বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মঠে দীপঙ্কর দীর্ঘদিন বাস করেন। পরবর্তীকালে ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বখ্যাত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সেই সময়ে তিব্বতের অধিপতি বিশেষ দূত পাঠিয়ে দীপঙ্করকে তিব্বতে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। ঘটনাচক্রে তিব্বত রাজ প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে দীপঙ্করের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে যান। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো ধর্মানারায়ণ চ্যাংচুর তিব্বতের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বতের বিনয়ধর মৃত রাজার পত্রটি সঙ্গে করে বিক্রমশীলা মহাবিহারে উপস্থিত হন। কিছুকাল থেকে দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে তিনি পত্রটি তাঁর হাতে দেন এবং নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়িত অবস্থার কথা জানতে পেরে দীপঙ্কর তিব্বতে যেতে সম্মত হলেন। যে সময় আচার্য রত্নাকর ছিলেন বিক্রমশীলা বিহারের অধিনায়ক। ভিক্ষুদের নৈতিক শৈথিল্য দূর করবার ক্ষমতা দীপঙ্কর ছাড়া আর কারও ছিল না। তাঁর প্রভাব তখন মগধজনপদের বিভিন্ন বিহার ও সঙ্ঘে বিস্তৃত।

এই সব অবলোকন করে আচার্য রত্নাকর দীপঙ্করকে কিছুদিন পরে তিব্বত যাত্রার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই দীপঙ্কর বিনয়ধরকে তিব্বতে যাবার সম্মতি জানিয়েছেন। তাই তখন তাঁকে অনুমতি দিতে হলো। পথে নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। রাজপুত্র পদ্মনাভ এই সময় দীপঙ্করের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুর পথসঙ্গী হয়ে তিব্বত রওনা হন। তিব্বতে দীপঙ্কর বিপুল ভাবে সংবর্ধিত হলেন। এই জ্ঞান তাপসকে ঘিরে সেখানে রচিত হলো এক পবিত্র উৎসবের পরিবেশ। কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' মন্ত্র। সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল রাজা চ্যাংচুর এবং ধর্মগুরু দীপঙ্করের নামে। তিব্বতীয় ধর্মগুরু এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অবনত মস্তকে সসম্ভ্রমে তাঁকে দর্শন করলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতে এসেছিলেন দীপঙ্কর— কাজেই তাঁর জীবনের শেষ কর্মস্থল হলো তিব্বত। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এখানে বহু লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তিব্বতে প্রচলিত মহাযান মতেরই প্রচার করেন।

বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থ দীপঙ্কর তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতাধিক। তিনি সহজ সরল সুললিত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ ও প্রচার করে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। □

নতুন ভারতের জন্য ব্রিটিশ আইনের বহিষ্কার এবং নয়া দণ্ডসংহিতা নির্মাণ আবশ্যক

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস

আজ একথা বলার ও ভাবার সময় হয়েছে যে, নতুন ভারতের জন্য ব্রিটিশ আইনের বহিষ্কার এবং নয়া দণ্ডসংহিতা নির্মাণ আবশ্যক রয়েছে। শার্জিল ইমাম, পিএফআই (সিমির উত্তরসূরি), শাহিন বাগ, মমতা, কেজরি, কেসিআর, উদ্ধব, রাহুল, আকবরউদ্দিন আর আসাদুদ্দিন ওয়েইসির কার্যক্রম থেকে স্পষ্ট হয়, ২০৪৭ সালের মধ্যে তারা ভারতকে এক ইসলামিক দেশে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় রয়েছে। কংগ্রেস আর কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান হয়। কারণ ছিল হিন্দুদের অন্তর্নিহিত কলহ, স্বার্থান্বেষী, ভ্রষ্টনেতার অপূরণীয় কামনা, লোভ ও অহংকার! আজ চীন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের চেয়েও মারাত্মক হয়ে উঠেছে হিন্দু নামধারী দেশীয়দের ষড়যন্ত্র! পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ঘটিবাটি ফেলে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। এবার কোথায় পালাবেন? হয় মরো; না হয়, ইসলাম কবুল করো!

১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সংযোজিত সেকুলারিজম, তথাকথিত ডেমোক্র্যাসি আর সংবিধানের আইন শুধু লাগু হয় হিন্দুদের জন্য। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে মুক্ত থাকে! যদিও সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য এক আইনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড আর ওয়াকফের সম্পত্তি আইন পরিষ্কার করে দেয়, সংবিধানের সঙ্গে ছলচাতুরীর ষড়যন্ত্র!

আফজল গুরুর ফাঁসি রদের জন্য সুপ্রিমকোর্ট মধ্যরাত্রে খুলে যায়। দেশদ্রোহী জুবের আহমেদ তিহার থেকে সহজেই ছাড়া পায় অথচ নূপুর শর্মাকে সত্য কথা (১৬ জুন, ২০২২, টিভি ডিবেট, হাদিসে আছে, ৬ বছরের আয়েশার সঙ্গে, পয়গম্বর মহম্মদের বিয়ে আর ৯ বছরে সহবাসের কাহিনি) বলার জন্য সুপ্রিমকোর্টের জজ পারদিওয়ালা এবং সূর্যকান্তকে শেষে শরিয়ার আশ্রয় নিতে হয়! তিনটি পরিবারের জজ ও উকিলরা গত ৭০ বছর ধরে কংগ্রেস তথা মুসলমানদের হয়ে ওকালতি করে অসংখ্য হিন্দুর সর্বনাশ করেছে। আর এখন মোদীর বিনাশের চেষ্টা করছে! ২০৪৭ সালের মধ্যেই ভারতকে গাজওয়া-ই-হিন্দ করার পরিকল্পনা শুধু জালিদার ফেজটুপি পরা মুসলমানরাই ভাবছে না! তাদের সহযোগী দেশদ্রোহীরাও সমানভাবে উদ্গ্রীব! পাটনার ফুলওয়ারি থেকে পাওয়া পিএফআই-এর ১১ পাতার ব্লু-প্রিন্টে পরিষ্কার লেখা আছে ২০৪৭ সালে কী হতে চলেছে! ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'সবুজ সাপেরা' সত্তর বছরে সত্যই অনেকটা এগিয়েছে!

যারা ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) থেকে শিক্ষা নেয় না, তাদের অস্তিত্ব, ভূগোল ও ইতিহাস নিঃশেষ হয়ে যায় অচিরেই। উদাহরণ— মিশর, সিরিয়া, জর্ডন, ইরাক ও ইরান। দু-তিন দশক বা শতকেই প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিলুপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান আজও কি আমাদের কাছে ইতিহাস নয়? স্পেনে ৬০০ বছর ইসলামিক শাসন ছিল কিন্তু রাজা তৃতীয় ফিলিপের তলোয়ার

ফ ঃ ৫

(১৬০৯) ত্রিশ লক্ষাধিক মূরকে আফ্রিকায় বিতাড়িত করেন। বাকিদের ধর্মান্তরিত করে। আমাদেরও উচিত পূর্বপুরুষদের বলিদান স্মরণ করে, উত্তরপুরুষদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে যাওয়া।

১৯৪৭-২০৪৭ মানে ১০০ বছরে ওরা গাজওয়া-ই-হিন্দের লক্ষ্যে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষায় আধুনিক মনস্কতা আনয়নের জন্য মোদী বলছেন, 'এক হাতে কোরান অন্য হাতে কম্পিউটার'। কিন্তু কজন তা সদর্থক অর্থে নিয়েছে? উলটে তার পরিণতি হয়েছে ভয়ানক! জিহাদ উল্কার বেগে ছড়িয়ে পড়েছে, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায়।

লোকে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, প্রভু পাদের কৃপায়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ছে, আক্রমণাত্মক ইসলামের গতিরোধ করার ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে, এক্স-মুসলমানরাই ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাকে ধ্বংস করবে, শিয়া-সুন্নির চিরন্তন লড়াই কিংবা চীন ও উত্তর কোরিয়ার কমিউনিজমেই ইসলামিক আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে পারবে।

শতবর্ষ আগেই অখণ্ড ভারতের মুসলমানদের দাবি ছিল, 'আমরা না-পাক হিন্দুর সঙ্গে থাকব না। আলাদা দেশ চাই'। অসংখ্য হিন্দু-শিখ নিধনের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র ৫ শতাংশ মুসলমান পবিত্রভূমি ইসলামিক পাকিস্তানে গেল। বাকি ৯৫ শতাংশ থেকে গেল ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বিশেষ সুবিধা ভোগের লালসায়। মুসলমানরা পেল আজাদি। আর হিন্দুরা পেল রেশন কার্ড আর শরণার্থীর সার্টিফিকেট। গত পঁচাত্তর বছরে ভারতের ৯টি রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েছে। কিন্তু মাইনরিটির কোনো সুবিধা পায়নি। লাদাখে ১ শতাংশ, কাশ্মীর, লাক্ষাদ্বীপ ও মিজোরামে ২ শতাংশ এবং নাগাল্যান্ডে ৮ শতাংশ হিন্দু রয়েছে। ভারতের ৭৭৩টি শহরের মধ্যে ২০০টি আজ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেরালার ওয়াইনাডে রাহুল এবং ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক জেতেন মুসলমানদের ভোটে। এখানে ভারতীয় দণ্ডবিধি, পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকে। মোদীর 'সবকা সাথ; সবকা বিশ্বাস' এখানে কাজ করে না। গোরখপুর নির্বাচন কেন্দ্রে যোগী আদিত্যনাথ একটি মুসলমান ভোটও পাননি।

নিম্ন অসমের ৯টি জেলাতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। বিহারের ৬টি জেলায় হিন্দু-পলায়ন এখনও জারি আছে। ঝাড়খণ্ডের ৩টি জেলায় শরিয়া আইন অনুসারে বিদ্যালয়গুলিতে বৃহস্পতিবারে অর্ধেক আর শুক্রবার পূর্ণ-ছুটি হয়। সকালের প্রার্থনায় জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ। সম্প্রতি রাজস্থানের কোটায় প্রাথমিক স্কুলের পুস্তকে বাবা-মায়ের বদলে আম্মি-আব্বুর কথা সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গে রামধনু আজ হয়েছে রংধনু, পিসি হয়েছে খালা আর কাকা হয়েছে চাচা! পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী (২,২১৬ কিমি) ১০টি জেলায় (২৩টির মধ্যে) অগুনতি অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশের কারণে হিন্দুরা জমিজায়গা বিক্রি করে হিন্দু অধ্যুষিত শহরে পালিয়ে যাচ্ছে। শরিয়া আইন চালু করতে ২০ শতাংশ মুসলমানই যথেষ্ট। তাই ফিরহাদ হাকিম গর্বের সঙ্গে বলেন, 'কলকাতা হচ্ছে মিনি-পাকিস্তান'। কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য মাত্র ৩০ শতাংশ ভোটের প্রয়োজন। মুসলমানের ২০ শতাংশ ভোট, যেদিন চন্দ্রশেখর আজাদের ১০ শতাংশের সঙ্গে যোগ দেবে সেদিন মমতা-মায়া-অখিলেশ-রাহুল আবার কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবে। ছদ্মবেশী সোনিয়া আর ওয়ারিস পাঠানরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনে নেমে পড়বে। ছোটো ওয়েসির হুমকি, মাত্র ২০ মিনিটেই হিন্দুস্থান থেকে সনাতন ধর্মের নাম নিশান মুছে দেবে'। আমাদের ১৪ লক্ষ সৈনিক ব্যস্ত থাকব সীমান্তে, বাংলাদেশ পূর্বে, পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে চীন আর দক্ষিণে আবরসাগরের বর্বর দস্যুদের মোকাবিলায়। সেদিন ওই সংবিধান আর রামমন্দির থাকবে না। আকাশে উড়বে ক্ষুধাতুর শকুন, গঙ্গা-যমুনা-কৃষ্ণা-কাবেরীর জল হবে লাল, সবুজ ধরিত্রী হবে রক্তাক্ত— থাকবে শুধু শ্মশানের শান্তি!

হিন্দুরাই বলে, বসুধৈব কুটুম্বকম, হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই, গঙ্গা-যমুনা-তহজিব আর সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। ধূর্ত ও সুচতুর ওয়েইসি মুচকি হেসে দম্ভের সঙ্গে বলে ভবিষ্যতে (২০৪৭) হিজাবধারী এক মুসলমান ইসলামিক ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হবে। আমার মতো, এককথায় যোগী-মোদীও বোধহয় হতভম্ব হয়েছেন। ওদের এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হিন্দুরা নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে জানে না। তাই মহুয়া মৈত্র আর মমতা ব্যানার্জি হিন্দু দেব-দেবী আর ধর্ম সম্বন্ধে এমন অর্বাচীনের মতো কথা বলেন। সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবির) ও বিকাশ ভট্টাচার্য গোমাংস খেয়ে সেকুলার হন।

পক্ষান্তরে, দুনিয়ার সমস্ত দার-উল-হারবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাকভোরে কাফেরের ঘুম ভাঙিয়ে আস্ফালনের সঙ্গে 'ফজরের' নামাজ পড়ে জেহাদিরা। সবুজ চাদর বিছানো মাজার থেকে বেয়নেটের চেয়ে সূতীক্ষ্ণ মিনারযুক্ত মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে দ্রুতগতিতে! 'হোয়াইট সুপ্রিমাসিকে' হটিয়ে দখল নিয়েছে 'ইসলামিক সুপ্রিমাসি'। ঊষর মরুর বর্বর দস্যুর দল আজ দুধসাদা আলখাল্লার আড়ালে নিজেদের রক্তাক্ত জিহাদের কুকীর্তিকে ঢাকতে চাইছে পোর্সেলিনের কাপ-ডিসের উপর কারুকার্য দেখিয়ে। হিন্দুর ঘুম ভাঙেনি। মুসলমান প্রীতির মোহভঙ্গ হয়নি। আর কবে হবে? হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা স্টেশন চত্বরে আজ অবৈধ অনুপ্রশেকারীদের রমরমা কারবার।

কলকাতা শহরের প্রতিটি মোড়ে মসজিদ আর ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। সবই ১৮৩৫ সালে স্থাপিত। রাহুল গান্ধীর ভাষায়, ভারতের ইতিহাস শুরু হয়েছে মুসলমান শাসনের পর। আমরা ক'জন বোকা চাড্ডীধারী, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার আর ফেসবুকে, 'জয় শ্রীরাম আর বন্দে মাতরম্' লিখে, আমাদের হিন্দুত্ব জাহির করছি। অন্যদিকে 'ইদে' শিশুদের ওরা উট-গোরুর মতো নিরীহ ও বিশালদেহী পশুকে ক্রূরতার সঙ্গে জবাই করা আর রাইফেল চালিয়ে মুশরিকদের মারার শিক্ষা দিচ্ছে।

চিরদিন তো মোদী-যোগী থাকবে না। অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মা কতদিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রোধ করবেন? অসমের বদরুদ্দিন আজমল, উত্তরপ্রদেশের মুখতার আনসারি, দিল্লির তাহির হাসান আর পশ্চিমবঙ্গের শাজাহান শেখরা ততদিনই বিরাজ করবে যতদিন না দেশ থেকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সমাজবাদী পার্টি, আপ আর তৃণমূলের দেশদ্রোহীরা উৎখাত হচ্ছে।

প্রতিদিন সীমান্তে (নেপাল-ভারত : ১৭৭০ কিলোমিটার এবং ভারত-বাংলাদেশ : ৪১৫০ কিলোমিটার) ৫ হাজারের বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশ আর দৈনিক ৮৬ হাজার মোমিন শিশু জন্মাচ্ছে মুশরিকদের মারবার জন্য। জনবিস্ফোরণ (প্রেসিডেন্ট রেগনকে লিবিয়ার কর্নেল গদ্দাফির হুমকি ছিল, 'অ্যাটম বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র') দিয়েই ওরা ভারত দখল

করবে।

সারাবিশ্বে আজ জিহাদের রক্তপাত। উদ্দেশ্য একটাই। ইসলামের পতাকার নীচে বিশ্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। সোমালিয়ার ইলহান ওমর এক হতভাগ্য শরণার্থী আমেরিকায় এসে আজ পার্লামেন্টারিয়ান হয়ে সারাবিশ্বে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে বেরাচ্ছেন। ভেবে দেখুন, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি আর সুপ্রিম কোর্টের জজ আলতামাস কবিরের কথা। কোরান ও হাদিসের শিক্ষা যে দেশে নাই সেদেশে অশান্তি বিরাজ করছে। ভারতে বকলমে শরিয়ার শাসন চলছে। ধর্মান্তরণ, অনুপ্রবেশ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো সক্ষম আইন নেই। সিএএ, এনআরসি লাগু হলো না। নূপুর শর্মার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে কিন্তু কানহাইয়া তেলির হত্যাকারী রিয়াজ ও গাউস মহম্মদের ফাঁসি হবে না। হবে ১৪ বছরের (যাবজ্জীবন) কারাবাস। তাও প্যারোলে বছর দুয়েক ছুটি কাটাবে। নীচে থেকে উপরে অনেক কোর্ট ঘুরে, শেষে সুপ্রিম কোর্ট ১০ বছরের মঞ্জুরি দেবে। এক্ষেত্রে আমেরিকায় হলে মৃত্যুদণ্ড অথবা ৫৫০ বছরের কারাবাস হতো মাত্র দু'বছরের মধ্যে। কংগ্রেসের কপিল সিব্বাল আর অভিষেক মনু সিংভী, এনসিপি-র মেমন, সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য জিহাদি ক্রিমিনালদের সংরক্ষণ দেন ভারতীয় আইন আর সংবিধানকে কলা দেখিয়ে।

অজিত সাক্সেনা, অঙ্কিত শর্মা, কমলেশ তিওয়ারি, নিকিতা তোমর ছাড়াও অসংখ্য হিন্দুর হত্যাকারী জিহাদিদের কারুরই ফাঁসি হয়নি। গত দুই দশকে কাসাভ, আফজল গুরু আর ইয়াকুব মেমন ছাড়া কারুরই ফাঁসি হয়নি। এই হচ্ছে ভারতীয় আইন! ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে ৩০২ ধারায় বলা হয়েছে হত্যাকারীর শাস্তি হলো ফাঁসি, আজীবন কারাবাস ও জরিমানা। বিদেশে কিন্তু হত্যাকারীর কড়া আইন। আমেকিরায় হত্যাকারীর মোটিভ, ব্যবহৃত অস্ত্র বা হত্যার প্রকারভেদে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির নিদান আছে।

ভারতে প্রতিদিনই লাভজেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ আর ধর্মান্তরণের কারণে একাধিক হিন্দুর প্রাণ নেওয়া হয়। কিন্তু কটি হত্যাকারী ধরা পড়ে? আমরা সমবেদনা জানাই, সাহস করে কাগজে লিখি, চাঁদা তুলে পীড়িত পরিবারকে সহায়তা দিই, তারপর সব ভুলে

যাই। সম্প্রতি তৃণমূলের তিন হিন্দু নেতাকে হত্যা করল তৃণমূলেরই গুন্ডারা। কেউ শুনেছেন তাদের শাস্তির কথা?

তাই ভারতীয় দণ্ডসংহিতার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে কেন্দ্র সরকারও এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। ছোটো ওয়েইসি মাত্র কুড়ি মিনিটে দেশর সমস্ত হিন্দুকে শেষ করে ফেলার হুমকি দিয়েও রেহাই পেয়ে যায়। ভারতের বিচার ব্যবস্থা এমনই দুর্ভাগ্যের। এমন ঘৃণাসূচক উক্তির জন্য আমেরিকায় কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর সশ্রম কারাবাস আর জীবনে কখনোও নির্বাচনে দাঁনানোর অনুমতি দেওয়া হয় না।

পিতা ও পুত্র পালানিয়াপ্পান আর কার্তি চিদাম্বরম বহাল তবিয়তে জেলের বাইরে । রাহুল আর সোনিয়া ২০১২ সালে ইডি-র নোটিশে অভিযুক্ত হয়েও বেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিট্টা কারাটে স্বীকার করেছে, সে যোলোজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ইয়াসিন মালিক চারজন ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের অফিসারকে গুলি করে ৩২ বছর বিনা শস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। ভারতীয় আইন আজও তাদের ফাঁসি দিতে পারেনি। ভাবতীয় দণ্ডসংহিতা হিন্দুর গলায় ফাঁস আর অন্যদের ক্ষেত্রে বরদান এবং প্রহসন মাত্র।

এই প্রতিবেদক সারা বিশ্বে ৬টি দেশে কাজ করার সময় ভারতের মতো এত অনিয়ম কোনো দেশে দেখেনি। চীনে অবৈধ অনুপ্রবেশ হয় না, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ভ্রষ্টাচার বিরোধী কঠোর আইন আছে। বিজয় মাল্য ভারতের ব্যাংক থেকে ১৯০ মিলিয়ন ডলার নিয়ে ব্রিটেনে পালিয়েছে আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে। অনুপ্রবেশকারীরা মাত্র পাঁচশো টাকায় ভুয়ো পাসপোর্ট, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ভোটার কার্ড বানাচ্ছে। অভিযোগ, রুবি হসপিটালের কাছে কোনো এক বিল্ডিঙে নাকি এসব কাজ হয়। অসমে এনআরসি লাগু করলেও ভ্রষ্টাচারী অফিসারদের অসহযোগিতায় বিফল হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে এসে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে আর জনবিস্ফোরণের দ্বারা ভারতকে গ্রাস করছে।

সমস্ত সমস্যারই সমাধান আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ বিল, মাদ্রাসা শিক্ষা রদ, সমান শিক্ষানীতি চালু, সাবার জন্য সমান আইন, অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ, ধর্মান্তরণ বিরোধী বিল, এবং ভ্রষ্টাচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন, হাওয়ালা এবং এফসিআরএ (২০১০)-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন পাশ করতেই হবে। তবেই ভারতকে রক্ষা করা যাবে। এরজন্য চাই জনসচেতনতা। টিভি, ডিবেট, সোস্যাল মিডিয়াতে আরোপ-প্রত্যারোপের মাধ্যমে একাজ করা যাবে না। মানুষকে পথে নামতে হবে। ব্রিটিশের তৈরি আইনের বহিষ্কার করে নিজের দেশের অনুকূলে নতুন দণ্ডসংহিতার প্রবর্তন করতে হবে। □

বিনোদিনী অপেরার দশম মঞ্চাভিনয়

সুমনা পাল ভট্টাচার্য

সম্প্রতি দশম মঞ্চাভিনয় সম্পন্ন হলো নাটকটির। ঠিক একইরকম সাফল্যের সঙ্গে যেমনটি সেদিন হয়েছিল, যেদিন চতুর্থ মঞ্চাভিনয়ের সাক্ষী হতে সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় প্যাচপ্যাচে গরমকে উপেক্ষা করে, পৌঁছে গেছিলাম অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে। মঞ্চস্থ হয়েছিল 'বিনোদিনী অপেরা'। দর্শক-শ্রোতায় ঠাসাঠাসি প্রেক্ষাগৃহ। শুধু তাই নয়, বহু বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য নাট্য সমালোচক, বহু উজ্জ্বল তারকা, চলচ্চিত্র অভিনেতা, সংগীত ও সুরের দুনিয়ার বহু নামি দামি ব্যক্তিত্ব আলো করে রেখেছিলেন দর্শকাসন। যথা সময়ে পর্দা উঠল ও একরাশ টানটান চমক নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন সমস্ত অভিনেতা। মঞ্চ সজ্জা, বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার, রূপসজ্জা, সংলাপ--- সবটাই এতো যথাযথ ও উচ্চ মানের যে দর্শকের করতালি বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছিল সমস্ত উপস্থাপনাটি কতখানি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

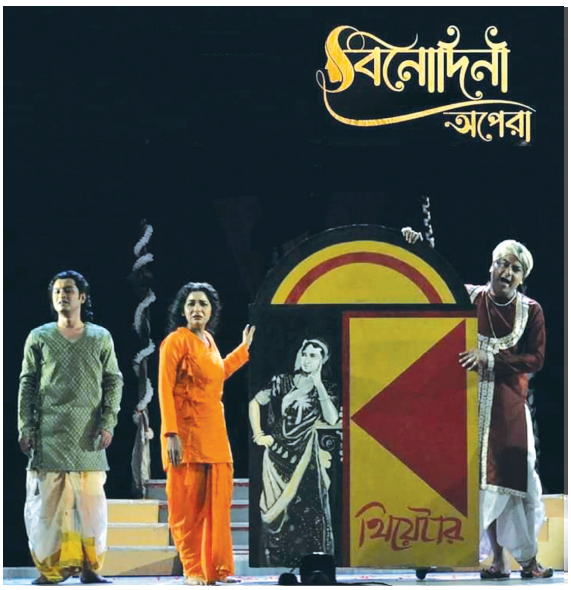

অভিনয় মানে যে কেবলই সংলাপের আদান-প্রদান নয়, নাচ, গান, মাইম সবকিছুর সমগ্র পরিবেশনা তা আবারও সামনে এল 'বিনোদিনী অপেরা'র হাত ধরে।

অবন্তী চক্রবর্তী পরিচালিত আঙ্গিকের এই নিবেদন নিশ্চিতভাবে দর্শক মনে রাখবে। কারণ এই সমগ্র পরিবেশনার মধ্যে কেবলই বাহ্যিক বিনোদন নেই, আছে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা, সংগৃহীত বহু তথ্য, সর্বোপরি প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রাণঢালা অভিনয়, যা নাটকের প্রতিটি মূহূর্তকে করে তুলেছে একেবারে জীবন্ত। কিছু কিছু দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন কুমার বাহাদুরের বিবাহসংবাদ পেয়ে নটী বিনোদিনীর বুকফাটা কান্না এবং তাঁর ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া বোঝাতে কনের শোলার মুকুটকে ছিঁড়ে ফেলার দৃশ্যটি এক অসম্ভব মর্মস্পর্শী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছিল। এমনই বহু চমক এই নাটকের পরতে পরতে রেখে গেছেন প্রতিটি কলাকুশলী। চৈতন্যরূপী বিনোদের যে আর্তি, যে ভাব, যে আত্মবিলীনতা, তাকে আরও প্রগাঢ়ভাবে দর্শকের সামনে এনেছে আলোকসম্পাত ও শব্দের অসাধারণ প্রয়োগ। মঞ্চসজ্জা, নাচের কোরিয়োগ্রাফি, গানের ব্যবহার সব কিছু এতো অতুলনীয় যে এই নাটকটিকে সামগ্রিকভাবে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে।

বিনোদিনীর চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তী অনন্য। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেত্রীর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কুমার বাহাদুরের চরিত্রে পদ্মনাভ দাশগুপ্ত বা গুর্মুখ রায়ের চরিত্রে সুজন মুখার্জী, গিরিশ ঘোষের চরিত্রে অভিজিৎ গুহ, এঁরা সকলেই খুবই যথাযথ ও নিজেদের নাট্যশৈলীর দক্ষতায় চরিত্রগুলিকে একেবারে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। রাঙাবাবুর চরিত্রে বিশ্বজিৎ দাস কিছু দৃশ্যে যেভাবে তার বিনোদিনীর প্রতি নীরব প্রেমের তাড়না বিনা সংলাপে কেবল অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। কনকের চরিত্রে ইন্দুদীপা সিনহা, তারাসুন্দরীর চরিত্রে দোয়েল এবং এলোকেশীর চরিত্রে বিদিশা সারা মঞ্চ শাসন করেছেন তাদের অনবদ্য নাচে, গানে, মুদ্রায়, মাইমে ও সর্বাঙ্গীণ উপস্থাপনায়। রাধাগোবিন্দের চরিত্রে সঞ্জীব, তিনিও তার চরিত্রে একেবারে প্রজ্বল। প্রতাপরাজ মুহূরীর চরিত্রে নান্দীপট সংস্থার নাট্যপরিচালক প্রকাশ ভট্টাচার্য। একটি মাত্র সংলাপেই বুঝিয়ে দিয়েছেন দীর্ঘকাল অভিনয়ের আতরে পরিচর্চিত হলে তার সুগন্ধ স্পষ্ট হবেই।

বিনোদিনীর মায়ের চরিত্রে অভিনেত্রী সর্বাণী ভট্টাচার্য। তাঁর অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি, সংলাপ প্রক্ষেপণ মাত্র ওই কয়েকটি দৃশ্যেই তাঁকে দর্শকের স্মরণে বহুদিন উজ্জ্বল করে রাখবে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর চরিত্রে তথাগত চক্রবর্তী তার অভিনয় দক্ষতা ও সুরেলা কণ্ঠস্বরের জন্য দর্শকাসনে নিজের জায়গাটি পাকা করে নিয়েছেন একথা বলাই বাহুল্য।

নাটকের শেষাঙ্কে দর্শকের সামনে অভিনেতারা নিয়ে আসেন এক প্রশ্ন, যে বিনোদিনী নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন কেবল থিয়েটারকে ভালোবেসে, অভিনয়কে ভালোবেসে, খোলা হাটে বাজি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়, সমগ্র নারীসত্তা, কেবল একটি স্বপ্নের বিনিময়ে--- 'হবে বি-থিয়েটার'... সেই থিয়েটার তো হলো, তার আত্মবলির বুকে পা রেখে কিন্তু তার নাম রইলো না কোথাও, তখন সমাজ তার সেই আত্মত্যাগের এক কণাও মনে না রেখে তাকে ব্রাত্য করতে সময় নিল না এতটুকু... এই কি ছিল তার প্রাপ্য?

আজও কি আমরা পারি না বিনোদিনীর স্বপ্নের বি থিয়েটার তাকে উপহার দিতে? সত্যিই এ প্রশ্ন করাঘাত করেছে দর্শকের মননে, চেতনায়। □

সারস্বত সাধনার মাধ্যমে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীকান্ত মাধব বৈদ্য সামাজিক মাধ্যমে একটি মেয়েকে নিয়ে তাঁর একটি পোস্ট করেছেন। মেয়েটির বাবা ইন্ডিয়ান অয়েলের একটি ছোটো পেট্রোল পাম্পের সামান্য মাইনের কর্মচারী। তাহলে কী এমন কাণ্ড করলো মেয়েটি যেখানে তাঁর বাবার সংস্থায় সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্তা বাধ্য হলেন তাঁকে নিয়ে এই পোস্ট করতে?

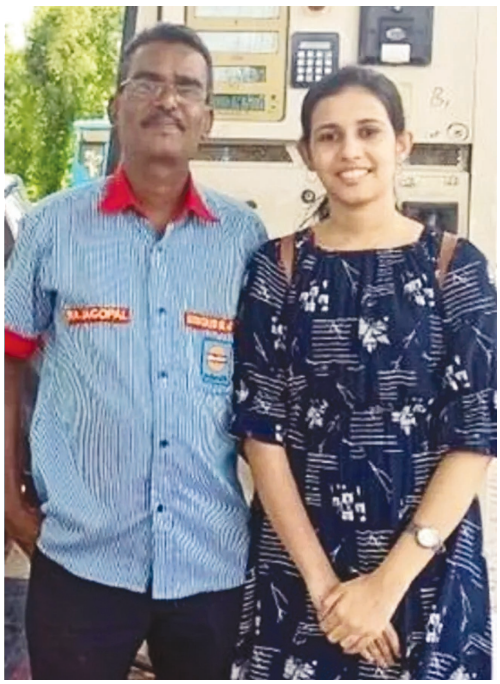

মেয়েটির নাম আর্যা রাজাগোপালন। কেরালায় তাঁর বাড়ি। আর্যার বাবার নাম এস রাজাগোপালন। কন্নুর জেলার পায়ানুর এলাকায় একটি ছোটো ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পে গত ২০ বছর ধরে কাজ করছেন রাজাগোপালন। পেট্রোল পাম্পে আসা বিভিন্ন যানবাহনে পেট্রোল ভরাই তাঁর কাজ। রাজাগোপালনের স্ত্রী অর্থাৎ আর্যার মা কে.কে.শোভা কাজ করেন বাজাজ মোটর্‌সে। ছোটোবেলা থেকেই অভাব যে কী বিষম বস্তু তা দেখেই বড়ো হয় আর্যা। বাবা-মাকে সারা দিন পরিশ্রম করতে দেখে সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল বড়ো হয়ে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাবে যে তখন তার বাবা-মাকে এরকম হাড়ভাঙা পরিশ্রম না করতে হয়। লক্ষ্যে তো স্থির, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছনোর রাস্তা কী হবে? আর্যা বুঝেছিল তাঁর মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্য পূরণের রাস্তা একটাই, পড়াশোনা। তাই মন দিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করলো আর্যা। পাশে পেল মা-বাবাকে।

নিজের সমস্ত শখ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়ে মেয়ের পড়াশোনা যাতে ভালো করে হয় সেই প্রয়াস করতে থাকলেন রাজাগোপালন ও তাঁর স্ত্রী। আর্যাও টিউশনি পড়িয়ে নিজের পড়াশোনার কিছু কিছু খরচ তুলতে লাগলো। স্কুলের পড়াশোনার শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে গিয়ে আর্যা বুঝতে পারলো শুধু বি.টেক পাশ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকলে আরও উন্নতির লক্ষ্যে সে এগোতে পারবে না। সেই জন্য চাই আরও উচ্চতর ডিগ্রি। আর তার জন্য চাই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি বা আইআইটি-তে সুযোগ পাওয়া। কারণ এই ইনস্টিটিউটে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়াটা দেশের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীর কাছে একটা স্বপ্নপূরণের বিষয়। এম. টেক পড়ার জন্য সে বেছে নিলো পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। পেট্রোল পাম্পের কর্মচারীর মেয়ে পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় শুনে আড়ালে হেসেছিল অনেকেই।

কিন্তু যখন আইআইটি-র রেজাল্ট প্রকাশ হলো, চুপ হয়ে গেল তারা সবাই। কানপুর আইআইটি-তে পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার সুযোগ পেল আর্যা। এই খবর কানে যেতে খোদ ইন্ডিয়ান অয়েলের চেয়ারম্যান পর্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আর্যার সাফল্যের সংবাদ পৌঁছে গেল ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরীর কাছে। তিনিও আর্যাকে অভিনন্দন জানিয়ে পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমে। রাজাগোপালন ও তাঁর মেয়ে আর্যাকে ভারতবর্ষের নতুন ইন্সপায়ারিং বাবা-মেয়ের জুটি বলে আখ্যায়িত করেন তিনি। মেয়ের সাফল্যের আনন্দে তো বটেই, উপরি পাওনা হিসাবে বড়ো মাপের মানুষজনের এই অভিনন্দন বার্তা রাজাগোপালন ও তাঁর স্ত্রীকে আপ্লুত করে। অন্য দিকে আর্যাও নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে খুব খুশি।

ভালো থাকুন আর্যা রাজাগোপালন। আর্যাদের মতো কঠোর পরিশ্রমী, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য লাভের এই জ্বলন্ত উদাহরণগুলোই এই প্রজন্মের তরুণদের কাছে প্রেরণাদায়ক ও আগামীদিনে লড়াই করার শক্তি হয়ে উঠুক। □

নিখুঁত বর্গের খোঁজে

সেদিন ছিল এক রবিবারের সন্ধ্যা। অধীর আর আনন্দ অমেয় জ্যেঠার পুবের ঘরে বসেছিল। ওদের স্কুলের মাস্টারমশাই ছাত্রদের এক মেন্টাল ম্যাথের বই অভ্যাস করতে বলেছেন। তাই সেদিন ওরা দুজন জ্যেঠার ঘরে মেন্টাল ম্যাথ নিয়ে চর্চা করছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা অভ্যাস করার পর অধীর বলে ওঠে আজ অনেক চর্চা হয়ে গেল, পরের দিন আবার করা যাবে। আর আমার মাথা নিতে পারছে না। জ্যেঠা বললেন, হ্যাঁ, আজ অনেকটাই অভ্যাস করেছ। মাঝে মাঝে এমন অভ্যাস করলে ক্যালকুলেশন করার ক্ষমতা বাড়ে, আর আনন্দও পাওয়া যায়। আজকে যখন আমরা এই চর্চা করছিলাম, মনে কর, কয়েকটা নিখুঁত বর্গের (square related) অঙ্ক ছিল। যেমন, (২৫^২ ১০^২)/৫^২। এই নিখুঁত বর্গে অঙ্ক করার সময় আমার অরেকটা সুন্দর অঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল। আনন্দ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, কী অঙ্ক? অমেয় জ্যেঠা বললেন, কী অধীর, বলবো?

দুজনেই সম্মতি প্রকাশ করলে জ্যেঠা একটা সাদা পেজে কয়েকটা সংখ্যা লিখে ফেললেন—'১১,১১১,১১১১,১১১১১,১১১১১১...'আর বললেন নিশ্চয় বুঝতে পারছে যে ১ ছাড়া এমন সব সংখ্যা লেখার চেষ্টা করছি যা কেবল ডিজিট '১' দ্বারা গঠিত। আমি সংখ্যাগুলো লেখার পর তিনটে ডট দিয়েছি, কারণ এমন অসংখ্য সংখ্যা আছে তাই। এই অসংখ্য সংখ্যার মধ্যে তোমাদের কাজ হলো যে কটি নিখুঁত বর্গের সংখ্যা আছে তা খুঁজে বার করা।

একটু দম নিয়ে জ্যেঠা আবার বললেন, প্রশ্নটি এভাবেও বলা যায়, '১' বাদে শুধুমাত্র '১' দ্বারা গঠিত সমস্ত প্রাকৃতিক সংখ্যার মধ্যে নিখুঁত বর্গের সংখ্যা কটি আছে? দুজনেই গভীরভাবে চিন্তা করে আনন্দ বলল, যেহেতু আমাদের কাছে ১ দ্বারা গঠিত অনন্ত সংখ্যা আছে,তাই আমার মনে হয় তার মধ্যে নিখুঁত বর্গের সংখ্যাও অনন্ত।

অমেয় জ্যেঠা একটু হেসে বসলেন, তুমি যে উত্তরই দাও না কেন তার পেছনে তোমোকে উপযুক্ত কারণ ও যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। তোমার যুক্তিটি ঠিক দাঁড়াচ্ছে না। আনন্দ ঘাড় নেড়ে আবার চিন্তায় ডুবে গেল। অধীর বলে উঠল, মোট এমন কত নিখুঁত বর্গের সংখ্যা পাওয়া যাবে তা বলতে পারছি না, তবে পাওয়া গেলে এটা বলতে পারি সেই নিখুঁত বর্গের সংখ্যাটির বর্গমূলের শেষ ডিজিট ৯ বা ১ হবে। জ্যেঠা অবার হেসে বললেন, হ্যাঁ, এটি একটি দারুণ উপলব্ধি, যেটি পরবর্তীকালে আমাদের নিশ্চয়ই কাজে লাগবে, তবে এই মুহূর্তে এটি অপ্রয়োজনীয়। তাহলে আমি সমাধানটি বলেই দি। অধীর আর আনন্দ হাল ছাড়তে না চাইলেও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জ্যেঠার কথায় রাজি হয়।

—আমি যে সংখ্যাগুলো লিখেছি তার মধ্যে একটিও নিখুঁত বর্গের সংখ্যা নেই।

অধীর ও আনন্দ দুজনেই বিস্ময় প্রকাশ করে। জ্যেঠা বলেন, যুক্তি দিচ্ছি দাঁড়াও। তার আগে ১০টি নিখুঁত বর্গের সংখ্যা বলো তো। আনন্দ বলে, ১, ৪, ৯,১৬, ২৫, ৩৬, ৪৯, ৬৪, ৮১ আর ১০০। জ্যেঠা বলেন, লক্ষ্য করো, ৪ দিয়ে ভাগ করলে এর মধ্যে কোনো সংখ্যাই ১ বা ০ ছাড়া অন্য কোনো ভাগশেষ রাখে না। মজার ব্যাপার এই যে, আমরা অতি সহজে প্রমাণ করতে পারি যে, যে কোনো নিখুঁত বর্গের সংখ্যা ৪ দ্বারা ভাজিত হলে কেবল ১ বা ০ ভাগশেষ রাখে । অর্থাৎ ২ আর ৩ কখনোই ভাগশেষ হতে পারে না।

অধীর প্রশ্ন করে, কিন্তু এই তথ্য আমরা আমাদের প্রশ্নে প্রয়োগ করব কীভাবে? জ্যেঠা বলেন, প্রথমে বলো ১১-কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কী হবে?

—৩।

—১১১-কে ৪ দিয়ে ভাগ করতে ভাগশেষ কী হবে?

—৩।

—১১১১-কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কী হবে?

—৩-ই হবে।

—এটা কি বুঝতে পারছ যে আমি যে ধরনের সংখ্যা লিখেছি, তার মধ্যে প্রতিটি সংখ্যাকেই ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ৩-ই হবে।

আনন্দ বলে, হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে কিন্তু প্রমাণ করি কীভাবে?

জ্যেঠা বলেন, তাহলে বলি। যদি x,y,z তিনটি প্রাকৃতিক সংখ্যা হয় এবং x-কে z দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ m পাওয়া যায় এবং y-কে z দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ n পাওয়া যায়, তাহলে x+ y কে z দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ m+n পাবে। এবং যদি m+n z -এর চেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা অথবা সমান হয়, তবে x +y z দ্বারা ভাগ করলে যা ভাগশেষ হবে, m+n-কে z দ্বারা ভাগ করলে তাই ভাগশেষ পাওয়া যাবে। এবার লক্ষ করো ১১-কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হয় ৩। আর লক্ষ্য করো আমরা যে সংখ্যাগুলি নিয়ে কাজ করছি সে সবগুলোকে ১০০k + ১১-র রূপে লেখা যায় যেখানে k হচ্ছে একটি 'উপযুক্ত' পূর্ণ সংখ্যা। ৪ ১০০k-কে 'সম্পূর্ণরূপে' ভাগ করে অর্থাৎ ভাগশেষ ০, এবং ১১-কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে অবশেষ ৩।

অবশেষে এটি দাঁড়ায় যে আমরা যে প্রকারের সংখ্যা লিখেছি তারা সবাই ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ৩ রাখে। আর আমরা আগেই দেখেছি যে নিখুঁত বর্গের সংখ্যা কোনো মতেই ৪ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ৩ রাখে না।

আনন্দ বলে উঠল, চমৎকার অঙ্ক। মাথা একেবারে খুলে গেল। অধীর বলল, হ্যাঁ, অঙ্কটা খুবই সুন্দর কিন্তু যে কোনো নিখুঁত বর্গের সংখ্যা যে ৪ দ্বারা ভাগ করলে ১ বা ০ শুধু ভাগশেষ রাখে, তা প্রমাণ করি কীভাবে?

জ্যেঠা ঘড়ির দেখে তাকিয়ে বললেন, আজ বেশ দেরি হয়ে গেছে। ওটা তোমরা বড়িতে গিয়ে ভালো করে ভেবো। ধরে নাও এটি তোমাদের হোমওয়ার্ক।

মৌনব দাস, দ্বাদশ শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, কলকাতা।

বীর বনবাসী

ভীমা নায়েক

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী ভীমা নায়েক ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমোহালি বাড়ওয়ানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভীল জনজাতি সমাজের মানুষ ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সাহস দেখান। মধ্যপ্রদেশে খানদেশের সুলতানপুর তালুকের খিটগাঁওয়ে ব্রিটিশ সামরিক ছাউনি আক্রমণ করেন। ১৮৬১ সালে ইংরেজ সৈন্য তাঁকে বন্দি করতে সমর্থ হয়। বিচারে তাঁর দ্বীপান্তরের সাজা হয়। ১৮৭৬ সালে আন্দামানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১৭ সালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান ভীমা নায়েকের পৈতৃক গ্রামে 'ভীমা নায়েক স্মারক' নির্মাণ করেন। রাজ্যে সরকারি এক যোজনার নাম ' শহিদ ভীমা নায়েক পরিযোজনা' রাখা হয়েছে।

জানো কি?

- মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরকে কমলার রাজধানী বলা হয়।।
- কর্ণাটকের মাত্তুর গ্রামের লোকেরা সংস্কৃত ভায়ায় কথা বলেন।
- গীতা প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন স্যার চার্লস্ উইলকিন্স।।
- ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী।
- ভারতে সবচেয়ে বড়ো পদের সরকারি চাকুরি হলো আইএএস।
- ভারতের কেরালা রাজ্যে সর্বপ্রথম বর্ষা আসে।

ভালো কথা

রাজহাঁসের ছানা

আমার বাবা তিন সপ্তাহ আগে জঙ্গলের ধারের পুকুরের পাড়ে একটা ডিম পেয়েছিলেন। ডিমটা অনেক বড়ো ছিল। ভাই সেটার ওমলেট খাবার বায়না ধরেছিল। কিন্তু বাবা সেটাকে ডিম ফোটানোর জন্য তা দেবার মুরগির ঝুড়িতে বসিয়েছিলেন। গতকাল ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে। সবগুলো মুরগির কিন্তু বড়ো ডিমটার একটা বড়ো হাঁসের বাচ্চা হয়েছে। সবাই বলছে এটা রাজহাঁসের বাচ্চা। কী রঙের হবে যেটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। বাবা বলছে রাজহাঁস বাড়িতে থাকা শুভ। আর সাদা রাজহাঁস মা সরস্বতীর বাহন। আমার তো সবুর সইছে না, কবে বড়ো হবে।

সুভদ্রা মাহাত, দশম শ্রেণী,কোটশিলা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক আ মা নু	(১) তি অ ব স ৎ থি ল
(২) ত ব র র্ষ	(২) শী উ র ত্ত প্র য় দে

৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) পোড়াকপাল (২) বাঁধনহারা

৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) সুদূরপরাহত (২) সামাজিকীকরণ

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মণ্ডহারবার, দ: ২৪ পর: । (২) শুভম হালদার, ১৮ মাইল, মালদা (৩) সুজয় মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) শেখর দাস, রবীন্দ্র নগর, শিলিগুড়ি।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

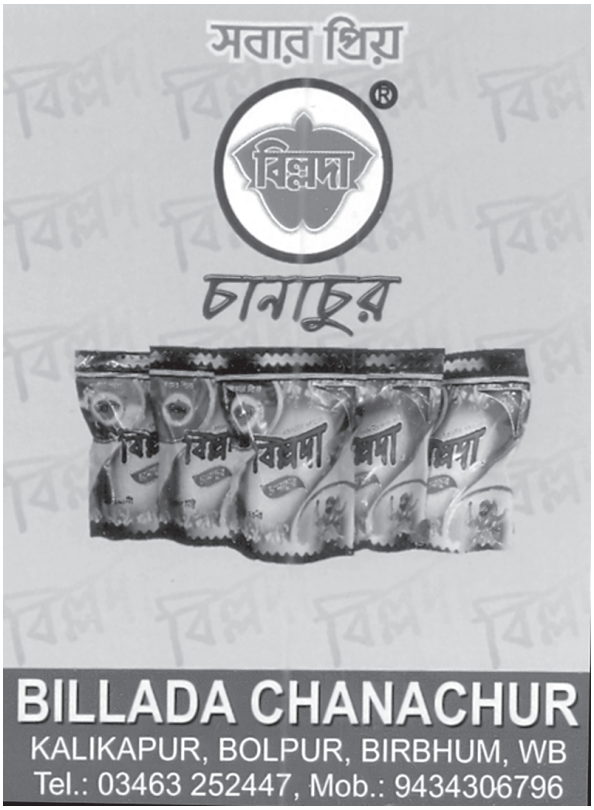

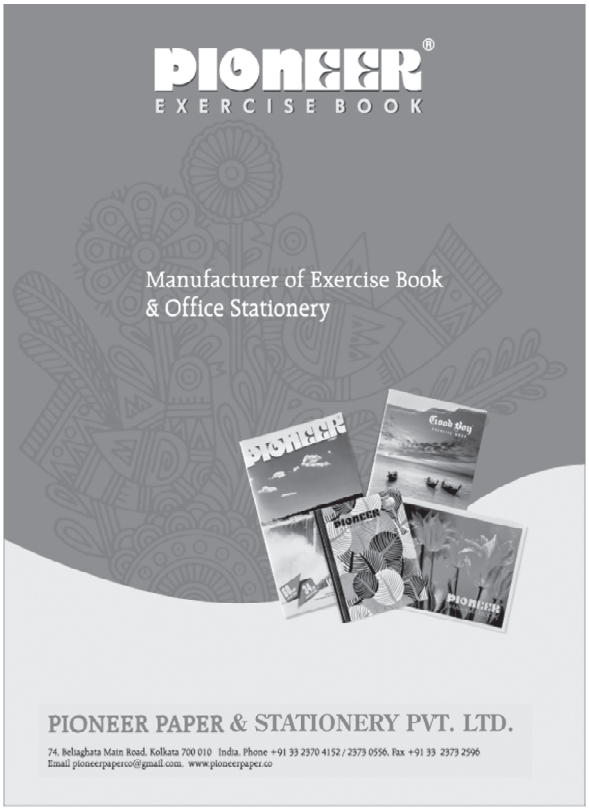

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারতের মেধার ওপর সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

আজ আমার যেসব যুবক-যুবতী বন্ধু নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন। কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদের বিশেষ প্রেরণা দেবে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। যাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেই যুবক-যুবতীদের এবং তাঁদের পরিবার পরিজনকে আমি অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনেক অনেক শুভকামনাও জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আগামী ২৫ বছর আমাদের সকলের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই দেশের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত বিশ্বে প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীর জন্যও এর থেকে বড়ো সুযোগ আর কিছু হতে পারে না। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে— এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে, তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে — এটাই হওয়া উচিত আপনাদের লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা যে গ্রামেই তা হোক, সর্বদা একথা মনে রাখবেন

ফঃ ৬

যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়, জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো আপনাদের ছোট্টো একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিল না। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাংকিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কার্যপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেই সময় একটি বিশেষ পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাংকে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনোই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাংকে ফোন করে দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয়বার ঋণ— এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদের ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে মুক্ত করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাংকগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোটো ছোটো ব্যাংকগুলিকে একত্রিত করে বড়ো ব্যাংক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাংকে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাংকের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাংক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাংকের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হতো বর্তমানে সেইসব ব্যাংকেরই রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারতের মজবুত ব্যাংকিং ক্ষেত্র এবং ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মচারী বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাংকে কর্মরত আমার কর্মচারী ভাই-বোনেদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যাংকের কর্মচারীরা কখনো আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। জনধন যোজনার কথা যখন আমার মনে এসেছিল তখন পুরনো ধ্যানধারণার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব গরিব মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল বারবার। ব্যাংকের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাংকের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন, সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথাবার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার ব্যাংকের বন্ধুরা গরিব মানুষের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিনরাত কাজ করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পেছনে ব্যাংক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাংক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।

কিছু কিছু মানুষ কোনোকিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য কোনো সংস্থান নেই।

ফুটপাথে বসে নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন, তাদের জন্য যখন সরকার স্বনিধি যোজনা শুরু করে, তখন আমাদের এই ব্যাংক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাংকের শাখায় তো এই ধরনের মানুষদের খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাংক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাংক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা ও ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি ব্যাংক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারাও যখনই ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপনাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষেকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আজ যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন তারা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।

যখন সঠিক চিন্তাভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমাণ মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ।

নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে, পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে তেরো কোটি মানুষ দারিদ্র্যরেখার উপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। গরিব মানুষদের পাকাবাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচাগার তৈরি করা বা বিদ্যুৎ সংযোগ করার মতো প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারি কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে আমরা সকলে মিলে যদি ভারতকে দারিদ্র্যমুক্ত করার চেষ্টা চালাই, তবে দেশ থেকে দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। এই কাজের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে দেশের সকল সরকারি কর্মচারীর ভূমিকা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। গরিব কল্যাণের কাজে যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, আমাদের সকলের সেগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং মানুষকে এবিষয়ে অবগত করাতে হবে।

ভারতে ক্রমাগত দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার অন্য একটি দিকও রয়েছে। দেশের নিও মিডল ক্লাস আওতাভুক্ত মানুষ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে। এই শ্রেণীর মানুষের নিজেদের চাহিদা রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যায় উৎপাদনের কাজ চলছে। বর্তমানে আমাদের কারখানা ও উদ্যোগ ক্ষেত্রগুলি রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন করছে। আমাদের কারখানাগুলিতে বর্তমানে যখন রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে তখন এর সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছেন আমাদের যুবক-যুবতীরা। সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন রেকর্ড নিয়ে বা নতুন সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে রেকর্ড পরিমাণ মোবাইল ফোন রপ্তানি হচ্ছে। দেশে বছরে প্রথম ছ'মাসের মধ্যে যত সংখ্যক গাড়ি বিক্রি হয়েছে তাও বিশিষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক। বৈদ্যুতিন সামগ্রীও ভারতে রেকর্ড পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে। এই সবকিছুর থেকে দেশে রোজগার বাড়ছে, বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ভারতের মেধার ওপরে বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে। বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থ-ব্যবস্থার দেশে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কমে যাচ্ছে যুবক-যুবতীদের সংখ্যা। কাজ করার মানুষও কমে যাচ্ছে। এজন্য বর্তমান সময় যুব প্রজন্মের প্রচুর কাজ করার সময়। নিজেদের দক্ষতা, ক্ষমতা বিকাশ করার প্রয়োজন। আমি দেখেছি যে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে মেধা, চিকিৎসক, নার্স এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে নির্মাণকর্মীদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভারতের মেধার কদর সকল দেশে সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে। এজন্য বিগত ৯ বছরে সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল যোজনার আওতায় আনুমানিক দেড় কোটির বেশি যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকার ৩০টি দক্ষ ভারত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্রগুলিতে বিশ্বের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমাদের যুবক-যুবতীদের প্রস্তুত করা হবে। সমগ্র দেশে বর্তমানে নতুন মেডিক্যাল কলেজ, নতুন আইটিআই, নতুন আইআইটি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কাজ চলছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে ৩৮০টির কাছাকাছি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। বিগত ৯ বছরে এই সংখ্যা বেড়ে ৭০০ ছাড়িয়েছে। এভাবেই নার্সিং কলেজের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বিশ্বের চাহিদা পূরণের জন্য যে দক্ষতা ভারতের যুবক-যুবতীদের রয়েছে তা বিকশিত করার জন্য নানান সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।

আপনারা সকলে অত্যন্ত সদর্থক পরিবেশে চাকরিতে যাচ্ছেন। আপনাদের ওপর এখন দেশের এই সদর্থক চিন্তাভাবনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের সকলের নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করার চেষ্টাও চালাতে হবে। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পরেও আপনারা শেখার এবং আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। আপনাদের সাহায্য করার জন্য সরকার সরকারি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম iGOT Karmayogi তৈরি করেছে। আমি আপনাদের সকলকে অধিক থেকে অধিকতর এই প্ল্যাটফর্মের সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আরও একবার আমি আপনাদের ও আপনাদের পরিবার পরিজনদের এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। নতুন এই দায়িত্ব একটি প্রারম্ভ বিন্দু মাত্র। আপনারা জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছান। যেখানেই আপনারা কাজ করার সুযোগ পাবেন সেখানেই আপনাদের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক নাগরিক তাঁদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের সুযোগ পাক। তৈরি হোক নতুন নতুন শক্তি— এই কামনা করি। আপনারাও আপনাদের সব স্বপ্ন পূরণ করুন, সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা রইল।

(গত ২২ জুলাই রোজগার যোজনা মেলায় সত্তর হাজার নিয়োগপত্র বণ্টনের পর অনলাইনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ)

রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা রাষ্ট্রভাব বিকাশের স্তম্ভ স্বরূপ

চন্দন রায়

রাষ্ট্রীয় অধিকার, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধ--- এই চার শব্দবন্ধ পারস্পরিক সুসম্পর্কযুক্ত ও সম্পৃক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। একের অনুপস্থিতিতে অপরটি দৃঢ় হতে পারে না। তাই একটি আদর্শ সুসংহত, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র গঠনের জন্য এই চার শব্দের মূল্যবোধ দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিক সমাজের বিবেক, চেতনায় ও মননে লালিত ও জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন একটি শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে :

ন রাষ্ট্র রাষ্ট্রতাং যাতি, সদ্য সংঘঠিত জনাঃ।
নদানিং রাষ্ট্রভাবস্য সুসংঘটিত জীবনম্।।

যে রাষ্ট্রে মানুষ সংগঠিত হয় না, সে রাষ্ট্র রাষ্ট্রত্ব প্রাপ্ত হয় না। সুসংগঠিত নাগরিক জীবনই রাষ্ট্রভাবের মূল ভিত্তি।

আমাদের এই ভারতভূমি বিদেশি শাসনের অধীনে যাওয়ার জন্য এই শ্লোক প্রমাণিত সত্য। মধ্যযুগে আরবীয় হানাদার বা দখলদারদের ভারত দখলের বিভিন্ন কারণের মধ্যে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা ও প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তি না থাকার কারণে অতি সহজে একের পর এক রাজ্য তারা দখল করেছিল এবং অবশেষে সমগ্র ভারত ভূমি তাদের পদানত হয়েছিল এবং বিজাতীয় শাসনের অধীন হয়ে পড়েছিল। কারণ রাষ্ট্র ভাব ও জাতীয়তাবোধের অভাবে রাজা, প্রজা ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো সুসংগঠিত রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। রাজার পরাজয়ে প্রজাদের মধ্যে কোনো মাথাব্যথা ও মনযন্ত্রণার কারণ হয়নি।

নাগরিকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজা বা শাসক পরিপূর্ণ ভাবে উদাসীন ছিল। ফলে নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ছিল অরক্ষিত। এর উত্তর অনুসন্ধান করলে একটা সত্য উন্মোচিত হবে। রাজ্যের নাগরিকরা এক জাতি, এক

নাগরিক হিসেবে রাজ্য থেকে প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিল না। ভারতে ইসলামি শাসনের অন্তিম লগ্নে একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ফলে ইউরোপীয় হানাদারেরা সহজেই ইসলামি শাসন থেকে ভারত ভূমি দখল করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইংরেজ শাসনের শেষ লগ্নে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে ভারতের দেশীয় রাজা ও সমগ্র ভারতব্যাপী পরাধীন নাগরিকদের মধ্যে প্রখর রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। ফলস্বরূপ আপামর জনতার স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটে এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতের স্বাধীনতার অন্তিম লগ্নে অভ্যন্তরীণ ভারত বিরোধী শক্তির চক্রান্তে ভারতীয় রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধে কুঠারাঘাত আসে। ফলে ভারতভূমি খণ্ডিত হয়, ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয়। তারপর থেকে স্বাধীন ভারতে সেই ভারত বিরোধী শক্তি ভারতের রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সাহিত্যে দখলদারি করে ভারতীয় রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধের ধারাকে বিপথগামী করে চলেছে। তাই বাইরের ও স্বদেশের রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধ বিরোধী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগের বা ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে সৃষ্ট রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা ভারতপ্রেমী ভারতবাসীর পবিত্র কর্ম ও ধর্ম।

এই রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধ দেশবাসীর মধ্যে তখনই জাগ্রত হবে যখন নাগরিক সমাজের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নাগরিক অধিকারসমূহ সুরক্ষিত থাকবে। ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জনের অমৃতকাল পালন করছে কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ ভারতবাসী তাঁদের রাষ্ট্রীয় নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন নয়। বরঞ্চ এই বিষয়ে অজ্ঞ ও উদাসীন, অথচ স্বাধীন ভারতের পবিত্র সংবিধান সকল নাগরিকদের জন্য বহু মূল্যবান ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সেই সময় রাষ্ট্রীয় অধিকার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান বা সচেতনতা না থাকার কারণে সাধারণ জনগণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বছরের পর বছর এক শ্রেণীর ভ্রষ্টাচারী দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারী ও মুখোশধারী জনসেবকরা কায়েমি স্বার্থে জনসেবার নামে জনগণের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং স্বীয় স্বার্থে ঘুষ নিয়েও লুটপাট করে বেআইনি সম্পদের পাহাড় নির্মাণ করেছে, আবার এই সম্পদ রক্ষার্থে নাগরিক সমাজের কণ্ঠরোধ করে সিন্ডিকেটবাজ, গুন্ডারাজ ও মাফিয়ারাজ সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে জনতার প্রাপ্য সুযোগসুবিধা সমূহ দেশের অজ্ঞ ও দুর্বল জনগণের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছতে পারে না, যার পরিণতিতে সাধারণ ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পরিবর্তন হতে পারেনি। এই অজ্ঞতা ও দারিদ্রতার অভিশাপের দুঃখে জর্জরিত জনতা অবশেষে না পাওয়ার বেদনায় বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণায় সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ রাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে দেশ ভক্তি, দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রভাব ও জাতীয়তাবোধ জাগরণে জনমনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তাই রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সুরক্ষায় জনজাগরণ নির্মাণের জন্য নাগরিক সমাজে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা আশু জরুরি। □

রাজ্যে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে

ডাঃ সমরজিৎ ঘটক

রোগব্যাধি শুধু জীবাণুর সংক্রমণ বা শারীরিক কারণেই হয় না, আর্থসামাজিক কারণেও জনস্বাস্থ্য খারাপ হয়। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় দুর্নীতি— রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ, প্রশাসনিক আধিকারিকের একাংশ এবং দলদাস পুলিশের একাংশ মিলে দুর্নীতি করে চলেছে। এই দুর্নীতি জনস্বাস্থ্যকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে।

● যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের বঞ্চিত করায় শিক্ষিত বেকারদের প্রবল মানসিক উদ্বেগ, সঙ্গে তাদের বৃদ্ধ মা-বাবাদের ভালো চিকিৎসা করাতে তারা অক্ষম।

● উন্নয়নের নাম করে যথেচ্ছভাবে দান-খয়রাতি, স্বজনপোষণ চলছে অথচ সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাকি, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের অতি নিকৃষ্ট মানের বেতন কাঠামো, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা মাসিক খরচা করতে পারছে না, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও আপোশ করতে হচ্ছে। দীর্ঘকালীন স্ট্রেস ওই কর্মচারীদের উদ্বেগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস রোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

● নতুন কলকারখানা না থাকায় বহু মানুষকে ভিন রাজ্যে গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। এই পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের বাড়িতে থেকে, বাড়ির খাবার খেয়ে কাজ করতে পারছে না। ভিনরাজ্যে কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া ঘরে একসঙ্গে অনেক শ্রমিক ডরমেটরির মতো থাকে, দিনের শেষে নিজের পরিবারকে দেখতে পাচ্ছে না। তাদের পরিবারে লোকেদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি অথবা অসুখ করলে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে না। এই শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা শৈশবে বাবাকে পাশে পাচ্ছে না।

● রাজনৈতিক খুন, বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে শিশুদের হাত উড়ে যাওয়া চরম দৃশ্যদূষণের উদাহরণ। এগুলো শিশুদের শৈশবের অনাবিল আনন্দ, খেলাধুলা, ভালোচিন্তা থেকে বঞ্চিত করে ভয়, অসুরক্ষার বাতাবরণ তৈরি করছে। এই শিশুরা বড়ো হয়ে কীভাবে মূল্যবোধ, উচ্চশিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশ নেবে?

● যথেচ্ছ বালি চুরি নদীর গতিপথ পালটে দিতে পারে। পুকুর বুজিয়ে প্রোমোটিং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ছে, পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অসময়ে বন্যা বা অনাবৃষ্টি ফসলের ক্ষতি করছে। এই সবকিছুই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

● কলকাতা কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রান্তিক মানুষদের গ্রাম থেকে দূরে এসে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করছে। লাগামছাড়া রোগীদের ভিড় ডাক্তারদের যেমন মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায় তেমনি চিকিৎসার গুণমান বজায় থাকে না। জেলা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে এমআরআই মেশিন, জটিল অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা থাকলে কলকাতার হাসপাতালে ভিড় কমবে। তবে এর জন্য অবশ্যই প্রান্তিক এলাকায় কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত ও সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা চাই। বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক তার উলটো।

● দুর্নীতিগ্রস্ত এই রাজ্যে এখন বিকালে মাঠে খেলা, ক্লাবে খেলার সরঞ্জাম থাকা, টুর্নামেন্ট করা ক্যারাম পেটানো, বৃক্ষরোপণ এসব কমে যাচ্ছে। উলটে ভাতা পাওয়া ক্লাবগুলোতে সিন্ডিকেট শিখছে। সন্ধে হলেই মদের দোকানে উপচে পড়া ভিড়— এসব কুরুচিশীল, রুগ্ন যুব সমাজ গড়ে তুলছে।

● ডেঙ্গু দমনে পুরসভাগুলির কর্মকাণ্ড সন্দেহজনক। যে ওষুধগুলি স্প্রে করা হয় তাতে সত্যি লার্ভানাশক পরিমাণ মতো থাকে কিনা কে জানে! পাড়ার পার্কগুলিতে মেশিন দিয়ে ধোঁয়া দিতে বিশেষ দেখা যায় না। অথচ পার্কগুলিতে শিশুরা খেলতে আসে। ডেঙ্গুতে মৃত্যু শূন্য করা যায়, কিন্তু আদতে তার জন্য কাজ হচ্ছে কি?

এই অন্ধকার, এই নৈরাজ্য, এই অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এখন আর টিভি চ্যানেলে বৈঠক করার বা বিতর্ক করার সময় নয়। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দ্রুত শয়তানকে উপড়ে ফেলতে হবে। দুর্নীতির আখড়াগুলো ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। তবেই শান্তি ফিরে আসবে। মানুষের মুখে হাসি ফুটবে। পশ্চিমবঙ্গের সুনাম ফিরবে।

ভারতীয় মনীষীরা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চেয়েছিলেন

তরুণ কুমার পণ্ডিত

গত ১ আগস্ট সংস্কৃত দিবস নীরবেই চলে গেল। অথচ বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ১৯৬৯ সালে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যে সংস্কৃত দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেকথা আমরা আর কতজনই-বা জানি। হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের অনেক বছর আগে থেকেই শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনটি যেটি এ বছর ১ আগস্ট ছিল সেটি হচ্ছে সংস্কৃত দিবস। সংস্কৃত দিবস হিসেবে ১ আগস্ট দিনটি অনেকদিন থেকেই পালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীকালে ২০০১ সাল থেকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রাবণী পূর্ণিমার আগের তিনদিন ও পূর্ণিমার পরে তিনদিন সংস্কৃত সপ্তাহ পালন করা হবে। ওই নির্দিষ্ট সপ্তাহে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সরকারি স্তরে ভারত জুড়ে সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার তথা পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। প্রাচীনকালে শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে শিক্ষাবর্ষের সূচনা হতো। ঋষিরা বিদ্যার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে বেদ অধ্যয়নের সূচনা করতেন। কিছুদিন আগেও সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বলে অবহেলা করা হতো। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংস্কৃত ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নতুন শিক্ষানীতিতে সরকার সংস্কৃত ভাষার মর্যাদাকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। অথচ জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে সেখানে প্রায় ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এমনকী স্পিচ থেরাপি হিসেবে জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও অঙ্কের ভিত্তি আরও দৃঢ় করতে সেখানে বাচ্চাদের সংস্কৃত শেখানো হয় এবং ক্রমাগত সংস্কৃত শেখার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও আয়ারল্যান্ডের বেশ কিছু স্কুলে বাধ্যতামূলক ভাবে সংস্কৃত পড়ানো হয়। কম্পিউটারের জন্য আদর্শ হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষায় কম্পিউটারের কোড তৈরিতে নিপুণভাবে সাহায্য করে থাকে। বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতকে কম্পিউটারের উপযোগী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও ষষ্ঠ ও সপ্তম জেনারেশনের কম্পিউটার তৈরিতে আমেরিকা সংস্কৃতকে নানাভাবে ব্যবহার করছে। এই মুহূর্তে যত শব্দ ব্যবহার করা হয় তার প্রায় ৭৮ কোটি শব্দ হলো সংস্কৃত।

ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইতিহাস ও পরম্পরাকে আমরা খুঁজে পাই সংস্কৃতের মধ্যে। প্রায় ৩৫০০ বছরের পুরনো হিন্দু সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে এই ভাষার মধ্যে। সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলা হয় এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে এই সংস্কৃত ভাষা নিয়ে এখনো বহুল আলোচনা ও চর্চা হচ্ছে, বিশেষ করে জার্মানিতে। যদিও ভারতের অধিবাসীরা খুব কমই এই ভাষা কথা বলে। সংস্কৃতে কথা বললে আপনি খুব সহজেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন। তবে ভারতের বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে সরকারি ভাষ্য স্থিরীকরণকালে সর্বভারতীয় ঐক্য, সর্বপ্রদেশীয় জনগণের প্রতি সমবিচার এবং ভাষার অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথা বিবেচনা করে সংস্কৃতকেই সেদিন গ্রহণ করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব এনেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ হতে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি নাজিরুদ্দিন আহমেদ। আর তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন গণপরিষদেরই তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্য ড. বি আর আম্বেদকর, ড. বি ভি কেসকার, শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারি, ড. পি. সুব্বারায়ন, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং আরও অনেকে। বাইরে থেকে স্যার মির্জা ইসমাইল, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক আচার্য চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমণ, ড. কৈলাসনাথ কাটজু, ড. পট্টভি সীতারামাইয়া, মাধব শ্রীহরি আনে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃত ভাষার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেশ্বরাইয়া এবং বিজ্ঞানী সিভি রমণ চাইতেন সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা

হোক। স্বাধীন ভারতের প্রথম সেনানায়ক কে.এম. কারিয়াপ্পাও এঁদের সঙ্গে সহমত ছিলেন। এঁরা তিনজনই কর্ণাটকের মানুষ। ড. পট্টভি সীতারামাইয়ার মতো বহু বিদ্বানরাই এই অভিমত যে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান থাকলে ভারতের যে কোনো ভাষা সহজেই শিখে নেওয়া যায়।

ভারতের প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম ভাষা সংস্কৃত। অখণ্ড ভারতের সনাতন সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী এই মধুময়ী দেবভাষা। ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যতম শিক্ষা নেতা বৈদেশিক স্যার ভোরের হেমেন উইলসনের স্বরচিত সংস্কৃত প্রশস্তিটি নজর কাড়ার মতো— 'ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুযমত্র সংস্কৃতে। সর্বদৈবও সমুন্মত্তা বা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।। যাদব ভারতবর্ষং স্যাদ যাবদ বিন্ধ্য হিমাচলৌ। যাবদ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।। প্রতীচ্য জগতে বর্তমানে প্রাচীন ভাষা লাতিনের যে প্রভাব ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের মাতৃভাষার বারোআনা শব্দই সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, রবীন্দ্র সংগীতের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

'অয়ি ভুবনমনমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননি জননী।
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বরচুম্বিত ভালহিমাচল-
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।।

এই শ্রুতিমধুর ভাবসমৃদ্ধ বাংলা গানটিকে একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য বলা চলে। প্রায় প্রতিটি ভারতীয় তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রতিদিন কিছু না কিছু সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ এবং শ্রবণ করে থাকেন। এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতের ব্যবহার নানা রূপে এখনো বর্তমান। সুতরাং এই দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন প্রতীচ্য জগতে ল্যাটিনের যে স্থান তার চেয়েও অধিকতরভাবে স্বকরণীয়।

আমাদের সংস্কৃতির চিরকালের বাহন এই সংস্কৃত ভাষা। মানব সভ্যতার অরুণোদয় মনীষা সূর্যের প্রথম প্রকাশকে বিধৃত করে রেখেছে সংস্কৃত ভাষা। সেই সুপ্রাচীন যুগে বিজ্ঞান সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা যে অতুলনীয় ফসল ফলিয়েছিল, সংস্কৃত ভাষাই বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নিকট সেই ফসল বহন করে এনেছে। এত বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টি সংস্কৃতের মতো আর কোনো ভাষায় হয়নি। জ্ঞানের সকল ধারাই এখানে পরিপুষ্ট হয়েছিল। ভারত বন্ধু বিখ্যাত মনীষী আচার্য ম্যাক্সমুলারের অভিমত, ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে যে বিপুল ও বিচিত্র জ্ঞানরাশি সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে, তার প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না।

অবাক হয়ে যাওয়ার মতো কথা হলো, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি.লিট উপাধি দেওয়ার সময়ে তাঁদের মানপত্র ল্যাটিন ভাষার প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন তা সংস্কৃত ভাষায়। এ না হয় ৮৩ বছরের কথা। ৫০০ বছর আগে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে বঙ্গদেশের রাজা প্রতাপাদিত্যের যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, সে সবই সংস্কৃত ভাষায় হয়েছিল। ওই সময়ের পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন এবং তার আগে বিহার, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন গিয়েছিলেন সেখানকার অগণিত নরনারী তাঁর মুখে যে কৃষ্ণ কথা শুনেছিলেন, সবই সংস্কৃত ভাষায়। তারা সংস্কৃত বুঝতেন এবং কিছু কিছু বলতেও পারতেন। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য, নিম্বাদিত্য প্রমুখ মনীষী সর্বত্রই সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দান করেছেন। শিক্ষিত হতে সাধারণ নর-নারী সকলেই তাঁদের সুভাষিত শুনেছে। অতএব, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা মণিপুর থেকে কচ্ছ— সারা ভারতবর্ষে সংস্কৃতভাষা আজও সকলকার মাতামহীস্বরূপা। ভারতের সব ভাষাই সংস্কৃত ভাষাপ্রসূত। ভাষাতাত্ত্বিকদের বিচারে যে ভাষা সর্বোৎকৃষ্টভাবে উৎকর্ষিত, অবিলম্বে আমরা সেই সংস্কৃতভাষাকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সকলে সমবেতভাবে সোচ্চার হই। □

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

প্রবাল, এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

জীবনী

বিজয় আঢ্য, নারায়ণ চক্রবর্তী

পুরাণ কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত রায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা